اقيموا الدين

রুকনিয়াতের দায়িত্ব ও মর্যাদা

অধ্যাপক গোলাম আযম

রুকনিয়াতের দায়িত্ব ও মর্যাদা

অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

রুকনিয়াতের দায়িত্ব ও মর্যাদা

অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রকাশক

আবুতাহের মুহাম্মদ মা'ছুম

চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

৫০৪/১, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

ফোন ঃ ৯৩৩১২৩৯, ৯৩৩১৫৮১, ৮৩৫৮৯৮৭

ফ্যাক্স ঃ ৯৩৩৯৩২৭

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ

জুলাই ১৯৮৭

পঞ্চম মুদ্রণ

আগস্ট - ২০০৯

শ্রাবণ - ১৪১৬

শাবান - ১৪৩০

নির্ধারিত মূল্য ঃ আঠার টাকা মাত্র

মুদ্রণে

আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস

৪২৩, বড় মগবাজার, ঢাকা।

প্রকাশকের কথা

আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য জামায়াতে ইসলামী নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সাংগঠনিক শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ব্যক্তিদের ঈমানী, ইলমী ও আমলী যোগ্যতার মানদণ্ডে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে।

কোন কর্মী ঈমান, ইলম ও আমলের দিক দিয়ে একটি নির্দিষ্টমানে পৌঁছার পরই তাকে সদস্য (রুকন) বানানো হয়। এ মান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করাই সদস্যদের (রুকনিয়াতের) দায়িত্ব। কিন্তু সদস্যদের (রুকনিয়াতের) দায়িত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতনতার অভাবে অনেকেই শপথের উপর টিকে থাকতে পারেন না। এ বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করে সদস্যদের (রুকনদের) মনের দুর্বলতা কাটিয়ে তুলতে ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নব উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে সাবেক আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম ১৯৮৬ সালের ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় ত্রিবার্ষিক সদস্য (রুকন) সম্মেলনে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ পেশ করেন এবং কারাগারে থাকাকালীন ১৯৯২ সালের কেন্দ্রীয় সদস্য (রুকন) সম্মেলন উপলক্ষে লিখিত বক্তব্য পাঠান। ঐ দু'টি ভাষণ ও লিখিত বক্তব্যের সমন্বয়েই "রুকনিয়াতের দায়িত্ব ও মর্যাদা" নামক বইটি প্রকাশ করা হয়।

আশা করি বইটি থেকে ইসলামী আন্দোলনের সদস্য (রুকন) ও কর্মীগণ চলার পথে নতুন প্রেরণা লাভ করবেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমীন।

আবুতাহের মুহাম্মদ মা'ছুম

ভূমিকা

১৯৮৭ সালে জুলাই মাসে 'রুকনিয়াতের দায়িত্ব' শিরোনামে যে পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় তা ১৯৮৬ সালের ২৭শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ত্রিবার্ষিক রুকন সম্মেলনে প্রদত্ত আমার ভাষণ ও পরদিন সম্মেলনের বিদায়ী ভাষণের একটি সংকলন। এতে প্রথমদিকে রুকনিয়াতের শপথের ভিত্তিতে দায়িত্বের বিশ্লেষণ রয়েছে এবং শেষদিকে রুকনিয়াতের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে 'দশ' দফা কাজের পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

এ 'দশ' দফার দ্বিতীয় দফাটি হলো 'রুকনিয়াতের হাইসিয়াত' সম্পর্কে সজাগ থাকা। এ বিষয়টি সেখানে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন বোধ করছিলাম।

কোন কর্মী ঈমান, ইলম ও আমলের দিক দিয়ে একটা নির্দিষ্ট মানে পৌঁছার পরই তাকে রুকন বানানো হয়। এ মান ক্রমে বৃদ্ধি করাই রুকনিয়াতের দায়িত্ব। কিন্তু রুকনদের মধ্যে যারা মান রক্ষা করতে ব্যর্থ হন তাদের মধ্যে কেউ পদত্যাগ করেন, আর কারো রুকনিয়াত বাতিল করতে হয়। অথচ কোন ব্যক্তি যদি বুঝে শুনে রুকনিয়াতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তার পক্ষে এ দায়িত্ব ত্যাগ করা মোটেই স্বাভাবিক নয়। বাইয়াতের রজ্জু ত্যাগ করা ঈমানের জন্য অত্যন্ত মারাত্মক।

যারা পদত্যাগ করেন অথবা যাদের রুকনিয়াত বাতিল হয় তাদের অনেক কয়জনের অবস্থা পর্যালোচনা করে আমি এ সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছি যে তারা 'রুকনিয়াতের হাইসিয়াত' বা মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন নন। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে ১৯৯২ এর রুকন সম্মেলনে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বক্তব্য রাখব। কিন্তু '৯২ সালের মার্চ মাসে সরকার আমাকে কারাগারে বন্দী করে রাখায় সে সুযোগ পেলাম না।

কিন্তু বিষয়টির গুরুত্ব এত তীব্রভাবে অনুভব করলাম যে জেলখানা থেকে এ বিষয়ে আমার বক্তব্য লিখিত আকারে পাঠিয়ে দিলাম এবং জামায়াত প্রকাশনীর পক্ষ থেকে সম্মেলনের পূর্বেই 'রুকনদের মান বৃদ্ধির গুরুত্ব' নামে তা প্রকাশিত হয়।

এ বিষয়টি যেহেতু রুকনিয়াতের সাথেই সম্পর্কিত সেহেতু 'রুকনিয়াতের দায়িত্বের' পাশেই 'রুকনিয়াতের মর্যাদা' একটি বই হিসাবেই প্রকাশিত হওয়া উচিত। তাই এখন "রুকনিয়াতের দায়িত্ব ও মর্যাদা" নামে বইটি রুকনদের খেদমতে পেশ করা হচ্ছে।

আল্লাহ্ পাক রুকন ভাই ও বোনদেরকে রুকনিয়াতের মর্যাদা উপলব্ধি করার তাওফীক দান করুন এবং রুকনিয়াতের শপথ অনুযায়ী এর মহান দায়িত্ব পালনের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। আমীন।

গোলাম আযম
২৫ শাবান ১৪১৪
৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪

সূচিপত্র

রুকনিয়াতের দায়িত্ব	৯
রুকন শব্দের বিশ্লেষণ	১১
জামায়াতের পরিভাষা হিসাবে রুকন শব্দের ব্যবহার	১২
গঠনতন্ত্রে রুকনের মর্যাদা	১২
রুকনিয়াতের শপথের বিশ্লেষণ	১৩
শপথনামার আসল কথা	১৬
ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক রুকনের দায়িত্ব	১৭
রুকনদের সমষ্টিগত দায়িত্ব	১৯
রুকনিয়াতের দায়িত্ববোধেসংকট	২০
জামায়াতের সম্মেলনে যোগদানের দায়িত্ব	২২
রুকনদের টারগেট সম্পর্কে আমীরে জামায়াতের ভাষণ	২৫
রুকনিয়াতের মর্যাদা	৩৫
সাংগঠনিক মর্যাদা	৩৬
রুকন বাছাই-এর উদ্দেশ্য	৩৬
এ বাছাই আসল বাছাই নয়	৩৭
আল্লাহ্ কিভাবে পরীক্ষা করেন	৩৮
আল্লাহ কেন এ পরীক্ষা করেন	৩৯
পরীক্ষায় ফেল হয় কেন	৪১
আল্লাহর বাছাই ও ছাঁটাই-নীতি	৪৩
আল্লাহর বাছাই-এর প্রমাণ	৪৪
হে মাবুদ ছাঁটাই হওয়া থেকে হেফাযত কর	৪৫
রুকনদের মান বৃদ্ধির গুরুত্ব	৪৬

بسم الله الرحمن الرحيم

রুকনিয়াতের দায়িত্ব

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর এ ত্রিবার্ষিক সম্মেলন ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকবে। ১৯৮৩ সালের রুকন সম্মেলনের সময় রুকন সংখ্যা একহাজারেরও কম ছিল। আজ ১৯৮৬ সালের শেষাংশে প্রায় দু'হাজারে এসে পৌঁছেছে। কারখানা বড় হলে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াই স্বাভাবিক। আল্লাহ্‌র রহমতে রুকন হবার গুরুত্বের অনুভূতি ও ঈমানী দায়িত্ববোধ জামায়াতের জনশক্তির মধ্যে ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ায় প্রতি মাসে নতুন রুকনের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এবারের রুকন সম্মেলন এমন এক সময় অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন জামায়াতে ইসলামী এদেশে একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে স্বীকৃত এবং এটাই সরকার ও অন্যান্য ইসলাম বিরোধী শক্তির আতংকের কারণ। বাতিল শক্তির সাথে ইসলামী আন্দোলনের সংঘর্ষ এখন আসন্ন। ছাত্র অংগনে তো অনেক আগেই সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। বিরোধীরা এবার জামায়াতের সাথে সংঘর্ষ পূর্বের যে কোন সময় থেকে বেশীই বাঁধিয়েছে। এটা মোটেই অপ্রত্যাশিত বা অস্বাভাবিক নয়। বাতিলের গা-জ্বালা যে পরিমাণ বাড়ছে ইসলামী আন্দোলনের অগ্রগতি ও বলিষ্ঠতার স্বীকৃতিও সে পরিমাণেই আমরা অনুভব করছি।

এ সম্মেলনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। বিগত কয়েক বছর জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে জামায়াতে ইসলামী অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে যুগপৎ কর্মসূচি নিয়ে যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে তাতে জামায়াতের প্রতি দেশের সচেতন নাগরিকের প্রত্যাশা বেড়ে গেছে। দশ কোটি মানুষের মৌলিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য জামায়াত এককভাবে আরও বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে চলুক এটাই রাজনীতি সচেতন মহল জামায়াতের নেতৃবৃন্দের নিকট জোর দাবী জানাচ্ছেন।

দেশের পরিস্থিতির প্রয়োজনে জামায়াতকে এ দায়িত্ব বহন করার জন্য যে কোন সময় সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। অধিকার বঞ্চিত মানুষের নিকট আল্লাহর দেয়া ইনসাফ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের জন্যই জামায়াতে ইসলামীর সৃষ্টি। এ দায়িত্ব এড়িয়ে চলার প্রশ্নই উঠে না। এ দায়িত্বের বোঝা কখন কতটুকু নেয়া উচিত ও সম্ভব তা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার। কিন্তু যেটুকু দায়িত্ব পালনের কর্মসূচিই গ্রহণ করা হয় তা বাস্তবায়িত করার ঝুঁকি রুকনগণকেই পোহাতে হয়। কারণ জিলা ও থানায় রুকনগণই আন্দোলনের প্রধান জিম্মাদার। এ জিম্মাদারী পালন করার জন্য শুধু থানায় নয় ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতৃত্বে পর্যন্ত রুকন থাকা প্রয়োজন।

জামায়াত যখন কোন কর্মসূচি গ্রহণ করে তখন প্রধানত রুকনগণকে সামনে রেখেই পরিকল্পনা রচনা করে থাকে। কারণ মূল দায়িত্ব রুকনগণের উপর রয়েছে। সকল রুকনকেই কোন না কোন পর্যায়ে দায়িত্বশীলের ভূমিকা পালন করতে হয়। জামায়াতের সকল জনশক্তিকে যথাযথভাবে কাজে লাগাবার দায়িত্বও রুকনগণের উপর বর্তায়। আল্লাহর পথে জান ও মাল এবং শ্রম ও মেধা কুরবান করার রক্তশপথ রুকনগণই নিয়ে থাকেন। তাদের বাইয়াতের জযবাই জামায়াতের প্রধান শক্তি। আর কেউ এগিয়ে আসুক বা না আসুক যে কোন অবস্থায় রুকনগণই দীনের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই এ সম্মেলনে রুকনিয়াতের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনার গুরুত্ব সবাই অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করছেন বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

রুকন শব্দের বিশ্লেষণ

رُكْنٌ আরবী শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ হলো Support বা Prop অবলম্বন, আশ্রয়, নির্ভর, সমর্থন, ভার বহন, আস্থা, শক্তির উৎস, মযবুত অংশ ইত্যাদি। যেহেতু স্তম্ভ বা খুঁটির উপর অবলম্বন করেই কোন ঘর খাড়া থাকে এবং স্তম্ভই ছাদের ভার বহন করে সেহেতু Secondary অর্থে স্তম্ভকেও রুকন বলা হয়। দালানের চার কোণের উপর নির্ভর করেই মাঝের দেয়াল টিকে থাকে বলে কোণকে রুকন বলা হয়। কাবা ঘরের যে কোণে তাওয়াফ করার সময় হাত ছোঁয়াতে হয় তাকে রুকনে ইয়ামানী বলা হয়। নামাযের ভেতরের ফরযসমূহকে এজন্যই রুকন বলা হয় যে এ সবের উপরই নামায শুদ্ধ হওয়া নির্ভর করে।

কুরআন মজীদে দু'জায়গায় রুকন শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সূরা হুদের ৮০ নং আয়াতে রয়েছে ঃ

قَالَ لَوْ اَنَّ لِىْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِىْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ .

যখন লুত (আ.) এর নিকট সুন্দর বালকের বেশে আগত কতক ফেরেশতাকে দেখে পাপীষ্ঠ লোকেরা তাদেরকে দেবার জন্য লুত (আ.) এর নিকট দাবী জানাল তখন অসহায়ভাবে তিনি ঐ কথাটি বলেছিলেন। এর অর্থ হলো "হায় আমার যদি এতখানি শক্তি থাকত যে তোমাদেরকে ঠেকাতে পারতাম অথবা যদি কোন মযবুত অবলম্বন পেতাম যার আশ্রয় নিতে পারতাম" এখানে رُكْنٍ شَدِيْدٍ মানে মযবুত অবলম্বন বা আশ্রয়।

সূরা আয যারিয়াতের ৩৯ নং আয়াতে আছে-

فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ وَقَالَ سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ .

যখন মূসা (আ.) ফিরআউনের নিকট নবুওয়তের প্রমাণ স্বরূপ নিদর্শনসমূহ পেশ করলেন তখন ফিরআউন মূসা (আ.) এর সাথে কী আচরণ করল তা প্রকাশ করতে গিয়ে এ আয়াতে বলা হয়েছে- "সে তখন নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে মুখ ফিরিয়ে বলল, এ লোক হয় যাদুকর আর না হয় জ্বিনগ্রস্ত।" এখানে রুকন মানে শক্তি।

জামায়াতের পরিভাষা হিসাবে রুকন শব্দের ব্যবহার

কুরআন হাকীমে রুকন শব্দটিকে মূল শাব্দিক অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। পয়লা আয়াতে- অবলম্বন, নির্ভর বা আশ্রয় অর্থে, আর দ্বিতীয় আয়াতে- শক্তি অর্থে। জামায়াতে ইসলামীও এর সদস্যগণকে এ দুটো অর্থেই রুকন আখ্যা দিয়েছে। জামায়াত এর গোটা জনশক্তিকে ইসলামী আন্দোলনের মূল শক্তি মনে করে না এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করার সময় প্রধানত রুকনগণের সংখ্যা ও যোগ্যতার উপর নির্ভর করেই কর্মসূচি গ্রহণ করে। নিম্নতম সংখ্যায় রুকন যোগাড় না হওয়া পর্যন্ত ইউনিয়ন, পৌরসভা বা থানা কেন, কোন জিলাও গঠনতান্ত্রিক মর্যাদা পায় না। যেখানে কয়েকজন রুকন থাকেন সেখানেই তাদের মধ্যে একজন আমীর হন। এ ইমারত ছাড়া কোন শাখা সাংগঠনিক স্বীকৃতি পায় না। তাই পরিভাষা হিসাবে رُكْنٌ এর এমন এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে যা শুধু সদস্য শব্দ দ্বারা বুঝানো যায় না। সদস্য শব্দটি সকল সংগঠনেই ব্যবহৃত হয়। রুকন শব্দ দ্বারা যে ওযন ও মর্যাদা বুঝায় এর কোন বিকল্প নেই।

আমাদের পরিভাষায় জামায়াত, আমীর, শূরা ও রুকন কুরআন ও হাদীস থেকেই গৃহীত। এর অনুবাদ বা বিকল্প কোন শব্দ এসব দ্বীনী পরিভাষার স্থলাভিষিক্ত হবার যোগ্য হতে পারে না।

গঠনতন্ত্রে রুকনের মর্যাদা

জামায়াতের লক্ষ লক্ষ সহযোগী সদস্য এবং কর্মী থাকা সত্ত্বেও গঠনতন্ত্রে শুধু রুকনদের দায়িত্ব, কর্তব্য, ক্ষমতা ও অধিকারের আলোচনাই রয়েছে। সর্বস্তরে জামায়াতের আমীর ও শূরার নির্বাচনে শুধু রুকনগণকে ভোটাধিকার দেয়া হয়েছে। আমীরে জামায়াত ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরাই জামায়াতের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী জামায়াতের পলিসি নির্ধারণ, পরিকল্পনা গ্রহণ, আন্দোলনের কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাজেট নির্ধারণ করার অধিকারী। এসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এ জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব যাদের উপর অর্পণ করা কর্তব্য তাদেরকে বাছাই করার ইখতিয়ার রুকন ছাড়া আর কারো উপর দেয়া যেতে পারে না।

গঠনতন্ত্রের এ দৃষ্টিভংগীকে সামনে রেখেই জামায়াতের কেন্দ্রীয় মাজলিশে শূরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে জাতীয় সংসদে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার উদ্দেশ্যে এমন কোন লোককে জামায়াতের পক্ষ থেকে মনোনয়ন দেয়া উচিত নয় যিনি আর সব দিক দিয়ে যত যোগ্যই হোন কিন্তু জামায়াতের রুকনিয়াতের শপথ নিতে রাযী নন।

রুকনিয়াতের শপথের বিশ্লেষণ

জামায়াতের পরিভাষায় রুকনের যে গুরুত্ব এবং গঠনতন্ত্রে এর যে মর্যাদা রয়েছে এর কারণ উপলব্ধি করতে হলে রুকনিয়াতের শপথনামা বা হলফ-নামার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এ শপথের মাধ্যমেই রুকনগণ জামায়াতের নিকট বাইয়াত হন। সুতরাং এর সার্বিক তাৎপর্য অনুধাবন করার উদ্দেশ্যে এর বিশ্লেষণ করার গুরুত্ব অপরিসীম।

শপথ বাক্য শুরু করার পূর্বে ভূমিকায় বলতে হয়-

> "আমি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর গঠনতন্ত্রে বর্ণিত আকীদা উহার ব্যাখ্যা সহকারে ভালভাবে বুঝিয়া লওয়ার পর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সাক্ষী রাখিয়া পূর্ণ দায়িত্ববোধের সহিত সাক্ষ্য দিতেছি যে..."

এ ভূমিকায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কথা রয়েছে। প্রথমতঃ কালেমায়ে তাইয়েবার যে ব্যাখ্যা জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে দেয়া হয়েছে সে ব্যাখ্যা ভালভাবে বুঝে নিয়ে কালেমাকে কবুল করার কথা স্বীকার করা হয়েছে। আর কালেমাই হলো জামায়াতে ইসলামীর মৌলিক আকীদা।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সাক্ষী রেখে শপথ নেয়া হচ্ছে।

তৃতীয়তঃ পূর্ণ দায়িত্ববোধের সাথে কালেমায়ে শাহাদাতের ঘোষণা দেয়া হচ্ছে।

আল্লাহকে সাক্ষী রেখে কোন ঘোষণা দিতে হলে পূর্ণ দায়িত্ববোধের সাথে দেয়ার চেতনা থাকাই স্বাভাবিক।

শপথের পয়লা দফা

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ -

এ কালেমায়ে শাহাদাতের মধ্যে জামায়াতের গঠনতন্ত্রে কালেমায়ে তাইয়েবার যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তারই সারকথা রয়েছে। এভাবে

কালেমাকে কবুল করার মর্ম অত্যন্ত গভীর। যিনি এ ঘোষণা দিচ্ছেন তিনি এ কথাই বুঝাতে চান যে মুসলিম সমাজে প্রচলিত ও না বুঝে উচ্চারিত মন্ত্রের মতো কালেমাকে তিনি গ্রহণ করছেন না। এ কালেমা দ্বারা যে বিস্তারিত আকীদা কুরআন ও সুন্নাহ হতে বুঝান হয়েছে সে ব্যাখ্যাই তিনি মনে প্রাণে কবুল করেছেন। বস্তুতঃ যিনি এ ব্যাখ্যা মেনে নেন তিনিই বিশুদ্ধ তাওহীদের আকীদা বুঝে নিতে সক্ষম হন। এ ব্যাখ্যা ছাড়া শিরকের খপ্পর থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। শির্ক এমন সূক্ষ্ম ফেতনা যে বহু মুখলিস দ্বীনদার লোকও শিরকে খফী বা পরোক্ষ ও গোপন ধরনের শিরক থেকে বেঁচে থাকতে সক্ষম হন না। অথচ শির্ক এমন এক মারাত্মক জিনিস যা সমস্ত নেক আমলকে বরবাদ করে দেয়। শির্ক থেকে বেঁচে থাকতে হলে জামায়াতের গঠনতন্ত্রে বর্ণিত কালেমার ব্যাখ্যা মাঝে মাঝে নতুন করে বুঝে নিয়ে ঈমানকে তাজা করতে থাকা উচিত। তাওহীদের বিপরীতই হলো শিরক। তাই শিরক সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকলে খাঁটি তাওহীদ সম্পর্কেও বিশুদ্ধ ধারণা জন্মাতে পারে না। তাই তাফহীমুল কুরআনের সূরা আল আনআমের ১২৮ নং টীকাটি ভালভাবে বুঝে নেয়া প্রয়োজন।

গঠনতন্ত্রে কালেমার দ্বিতীয়াংশের যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তা বুঝে না নিলে রাসূল (সা.) এর প্রতি ঈমান আনার তাৎপর্যই স্পষ্ট হতে পারে না। ইসলামে নবীর যে মর্যাদা তা আর কোন মানুষকে কোনভাবেই যে দেয়া চলে না এবং সকল বিষয়েই একমাত্র রাসূলই যে দ্বীনের ব্যাপারে একমাত্র উসওয়ায়ে হাসানা সে আকীদা মযবুত করার জন্যই ঐ ব্যাখ্যা জানা প্রয়োজন।[১]

এ থেকে বুঝা গেল যে শপথনামার প্রথম দফাটি আকীদার সাথে সম্পর্কিত। আর আকীদাই যেহেতু ঈমানের ভিত্তি সেহেতু আকীদা দুরস্ত না হলে আমলের কোন মূল্য থাকে না। জামায়াতে ইসলামীর নিকট আকীদার এত গুরুত্ব থাকার কারণেই কালেমার বিস্তারিত ব্যাখ্যার উপর এত জোর দেয়া হয়েছে।

শপথের দ্বিতীয় দফা

রুকনিয়াতের শপথ গ্রহণকারী দ্বিতীয় দফায় ঘোষণা করেন যে, জামায়াতে ইসলামীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যা তা-ই তার জীবনের উদ্দেশ্য। তিনি দুনিয়ার

১. এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে হলে লেখকের 'ইসলামে নবীর মর্যাদা' পুস্তিকাটি পড়া দরকার।

কোন স্বার্থ হাসিলের নিয়তে জামায়াতে শামিল হচ্ছেন না, বরং দ্বীন কায়েমের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন সাফল্য অর্জন করাকেই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করছেন।

এ দফায় তিনি জামায়াতকে নিশ্চয়তা দান করছেন যে তিনি আখিরাতের কামিয়াবীর লক্ষ্যবিন্দুকে সামনে রেখেই এ পথে এসেছেন। জামায়াত থেকে কিছু নেবার জন্য তিনি আসছেন না। বরং তার সবকিছু জামায়াতের মাধ্যমে আল্লাহর হাতে তুলে দেবার নিয়তেই তিনি রুকনিয়াতের বাইয়াত কবুল করেছেন।

এ দফাটিতে পূর্ণ নিঃস্বার্থতার যে ঘোষণা দেয়া হয়েছে তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শপথের এ দফাটির গুরুত্ব যারা ভুলে যান তারাই নানা অজুহাতে রুকনিয়াতের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন। জামায়াতের মাধ্যমে কোন বিশেষ সুযোগ বা মর্যাদা না পেলে কোন দায়িত্ব থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়া হলে, কোন দায়িত্বশীলের কাছ থেকে আশানুরূপ ভাল ব্যবহার না পেলে, কোন বিষয়ে তার মতামত গৃহীত না হলে যদি কোন রুকন নিষ্ক্রিয় হয়ে যান বা মনক্ষুণ্ন হয়ে কাজে ঢিলা হয়ে যান তাহলে এটাই প্রমাণ হয়ে যে তাঁর শপথের দ্বিতীয় দফাটি তিনি ভুলে গেছেন। যদি আল্লাহর সন্তুষ্টিই একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তাহলে কোন কারণেই রুকনিয়াতের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা চলে না।

শপথের তৃতীয় দফা

শপথের এ দফাটি জামায়াতের গঠনতন্ত্র আন্তরিকতার সাথে মেনে চলার এবং জামায়াতের নিয়ম-শৃংখলার পূর্ণ আনুগত্যের ওয়াদা। গঠনতন্ত্রের ৭ নং ধারায় রুকন হবার যে শর্তাবলীর উল্লেখ রয়েছে তা পালন করার স্বীকৃতিই এ দফাটির উদ্দেশ্য। এ দফাটির ওয়াদা পূরণ করতে হলে গঠনতন্ত্রের ৯ নং ধারায় রুকনের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং ১০ নং ধারায় মহিলা রুকনদের বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্যের যে তালিকা দেয়া আছে সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এ দফার ওয়াদা যথাযথরূপে পালন করতে হলে মাঝে মাঝে এ কয়েকটি ধারা মনের মধ্যে তাজা করে নেয়া প্রয়োজন।

শপথনামার আসল কথা

শপথনামার শেষাংশে সূরা আল আনয়ামের ১৬২নং আয়াতটি তেলাওয়াত করতে হয় যার মাধ্যমে রাব্বুল আলামীনের নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণা করা হয়। আল্লাহ্ পাক স্বয়ং এভাবে আত্মসমর্পণ করার জন্য রাসূল (স.)-কে নির্দেশ দিয়েছেন। সত্যিকার চেতনা ও অনুভূতি নিয়ে এ আয়াতটি তেলাওয়াত করা হলে নিজের পূর্ণ সত্তাকে মহান ও মেহেরবান মনিবের নিকট সোপর্দ করার এমন এক অনাবিল তৃপ্তি অনুভূত হয় যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আল্লাহর খাঁটি বান্দাহর জন্য এর চেয়ে বড় তৃপ্তি আর কিছুই হতে পারে না। তাঁর সন্তোষের কামনা নিয়ে তাঁর মর্জির নিকট নিজের সব চাওয়া-পাওয়ার বাসনা কুরবান করার চাইতে বড় পাওয়া আর কী-ই বা হতে পারে! আল্লাহর সাথে এ সম্পর্ক ব্যক্তিগত নিজস্ব অনুভূতির ব্যাপার। সূফীদের পরিভাষায় এ অনুভূতির নামই 'ফানা ফিল্লাহ'।

শপথনামাটির এ বিশ্লেষণ থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে যিনি রুকনিয়াতের শপথ নেন তিনি-

প্রথমতঃ আল্লাহ তায়ালাকে সাক্ষী রেখে পূর্ণ দায়িত্ববোধের সাথে কালেমায়ে শাহাদাতের মাধ্যমে তাওহীদ ও রিসালতের সঠিক ইসলামী আকীদা কবুল করার কথা ঘোষণা করেন।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর দ্বীনকে কায়েমের সর্বাত্মক চেষ্টা করার মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই তিনি জামায়াতে ইসলামীর রুকনিয়াত কবুল করলেন।

তৃতীয়তঃ এ পথে সুশৃংখলভাবে চলার লক্ষ্যে জামায়াতের গঠনতন্ত্র মোতাবেক সংগঠনের পূর্ণ আনুগত্য করার ওয়াদাই তিনি করলেন।

চতুর্থত ঃ

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

বলে তিনি নিজের জান-মালসহ সমগ্র সত্তাকে আল্লাহর মর্জির নিকট সোপর্দ করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন।

গঠনতন্ত্রের ৮নং ধারা অনুযায়ী আমীরে জামায়াত বা তাঁর কোন প্রতিনিধির সামনে রুকনিয়াতের এ শপথ নিতে হয়। অর্থাৎ এ সব ওয়াদা আল্লাহর সাথে গোপনে নেয়াই যথেষ্ট নয়, আল্লাহকে সাক্ষী রেখে প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে সংগঠনের নিকট এ সব ওয়াদায় আবদ্ধ হওয়ার নামই রুকনিয়াত। আর এভাবে রুকনিয়াত কবুল করাই ইসলামী পরিভাষায় বাইয়াত হিসাবে গণ্য।

ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক রুকনের দায়িত্ব

কুরআন ও সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরামের জীবন থেকে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে ইকামাতে দ্বীন সকল ফরযের চেয়ে বড় ফরয এবং এ ফরযটি একা আদায় করা সম্ভব নয় বলে জামায়াতবদ্ধ হওয়া হলো দ্বিতীয় বড় ফরয়। দায়িত্ব পালনের জন্যই আমরা জামায়াতে ইসলামীর রুকন হয়েছি। সংগঠনের পক্ষ থেকে যার উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয় তা পালন করাই সাংগঠনিক কর্তব্য।

কিন্তু প্রত্যেক রুকনকে রুকনিয়াতের দায়িত্ব সম্পর্কেই যথাসাধ্য চিন্তাভাবনা ও চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যাওয়া উচিত। এ বিষয়ে সবার বিবেচনার জন্য কয়েকটি দায়িত্বের কথা এখানে পেশ করা হচ্ছে ঃ

১. আত্ম-সমালোচনার দায়িত্ব

জামায়াতে ইসলামীর মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বিচারে ও জামায়াতের একজন রুকন হিসাবে আমার ঈমান, ইলম ও আমলের মান আমার বিবেকের নিকট সন্তোষজনক কিনা এ পর্যালোচনা নিয়মিত হওয়া উচিত। জামায়াতের রিপোর্ট বইতে এ উদ্দেশ্যেই আত্মসমালোচনার হিসাব রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২. মান বৃদ্ধির দায়িত্ব

আমাদের দ্বীনি মান ও সংগঠনের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা ক্রমাগত বাড়ছে কিনা সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। আল্লাহর সৃষ্টির কোথাও স্থবিরতা নেই। হয় উন্নতির দিকে যাবে আর না হয় অবনতি অনিবার্য হয়ে পড়বে। এ শাশ্বত নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না। যদি আমাদের মধ্যে অগ্রগতির ধারা অব্যাহত না থাকে তাহলেই পশ্চাদপদ হয়ে পড়ার কারণ ঘটবে। এ কারণেই রিপোর্টের মাধ্যমে মানোন্নয়ন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

৩. জামায়াতের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব

এ বিষয়েও আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে যে আমাদের চারপাশে আল্লাহর বান্দাহরা আমাদেরই মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামীকে জানার

সুযোগ পাবে। আমাদের কথা ও কাজ এবং আচার-আচরণ ও লেনদেন যদি ইসলামী মানের না হয় তাহলে রুকন হিসাবে আমরা জামায়াতের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হব। প্রত্যেকের মাঝেই এ পেরেশানী থাকা দরকার যে আমার কারণে যদি একজন লোকের মনেও জামায়াত সম্পর্কে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয় তাহলে আল্লাহর নিকট কী জবাব দেব। এ চেতনা সজাগ থাকা অত্যন্ত জরুরী।

৪. যোগ্য লোক তৈরীর দায়িত্ব

যার উপর জামায়াতের পক্ষ থেকে যে সাংগঠনিক দায়িত্ব অর্পিত আছে তা যথাযথভাবে পালন করার সাথে সাথে এ চেষ্টাও চালাতে হবে যাতে অন্য রুকনদের মধ্যে এ দায়িত্ব গ্রহণ করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। তাদেরকে পরামর্শে শরীক করলে এবং দায়িত্ব বণ্টন করার মাধ্যমে সম্ভাবনাময় লোকদেরকে যোগ্যতর হয়ে গড়ে উঠবার সুযোগ দিলে নেতৃত্বের যোগ্য লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের যোগ্য লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা দায়িত্বশীলদেরই প্রধান দায়িত্ব।

যে দায়িত্বশীল অপরকে যোগ্য বানাবার সাধনা করে তার নিজের যোগ্যতা নিশ্চিতভাবেই বৃদ্ধি পায় এবং এ জাতীয় লোকদেরকেই সংগঠন আরও বৃহত্তর দায়িত্বে নিযুক্ত করে। এটাই নেতৃত্বের মান বৃদ্ধির উপায়।

৫. একটি বিষয়ে আমাদের সকলকে সতর্ক থাকতে হবে যে কোন কারণে যেন রুকনিয়াতের দায়িত্ব পালনে অবহেলা হয়ে না যায়। শয়তান, নাফস বা কোন মানুষ অপরের দোষ-ক্রটিকে অজুহাত হিসাবে আমার সামনে যতই খাড়া করুক কোন যুক্তিতেই আমার দায়িত্ব পালনে সামান্য ক্রটিও হতে দেব না- এ প্রতিজ্ঞা ছাড়া এ জাতীয় রোগ থেকে মুক্তির আর কোন উপায় নেই।

৬. আর্থিক দুরবস্থা, পারিবারিক সংকট, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে দায়িত্ব পালনে সমস্যা সৃষ্টি হলে উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলের নিকট সমাধানের পরামর্শ চাইতে হবে। নিজে নিজেই কাজ না করার বা কাজে ঢিলে দেবার সিদ্ধান্ত নিলে রুকনিয়াতের শপথের খেলাফ হয়ে যাবে।

৭. আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এ মনোভাব থাকতে হবে যে আল্লাহর সন্তুষ্টিই যেহেতু আমার আসল কাম্য সেহেতু আমার প্রতিটি কাজের ব্যাপারে তাঁর কাছেই আমার জওয়াবদিহি করতে হবে। তাই আর কেউ তার দায়িত্ব পালন করুক বা না করুক আমার দায়িত্ব ঠিকমতোই পালন করতে থাকব। অন্যের ত্রুটির জন্য আল্লাহর নিকট আমি দায়ী হব না। তাই অন্যের ত্রুটির দোহাই দিয়ে আমার অবহেলাকে জায়েয মনে করার কোন যুক্তি নেই।

রুকনদের সমষ্টিগত দায়িত্ব

জামায়াতে ইসলামী এদেশে ইকামাতে দ্বীনের যে দায়িত্ব নিয়ে ইসলামী আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এর অনিবার্য দাবীই হলো দেশের দশকোটি জনতাকে আল্লাহর পথে আনা। এ দায়িত্ব সফলতার সাথে পালন করতে হলে জামায়াতের রুকনগণকে জনগণের নেতৃত্বের মর্যাদা পেতে হবে। দেশ-ভিত্তিক নেতৃত্ব থেকে শুরু করে জিলা, থানা, পৌরসভা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড ও গ্রাম-ভিত্তিক (Chain of leadership) নেতৃত্বের সিলসিলা সৃষ্টি হতে হবে। সর্বস্তরে রুকনদের সংখ্যা এমন হতে হবে যাতে ইমারত কায়েম হয়। জিলা, থানা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে যারা জামায়াতের আমীর হিসাবে দায়িত্বশীল হন তাদেরকেই জনগণের নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

দেশের জনগণ ইসলামকে যতই পছন্দ করুক ইসলামী ব্যক্তিত্ব তাদের নিকট নেতৃত্বের মর্যাদা না পেলে ইসলামের বিজয় কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই জামায়াতের দায়িত্বশীলগণ যাতে জননেতা হিসাবে গণ্য হন সে বিষয়ে সুপরিকল্পিত কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে এখানে কয়েকটি বিশেষ করণীয় বিষয় পেশ করা হচ্ছে।

১। জামায়াতের দায়িত্বশীলগণকে একাধারে ধর্মীয় নেতা ও রাজনৈতিক নেতা হিসাবে গণ্য হবার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। তাদেরকে সমান যোগ্যতার সাথে দ্বীনের দাওয়াত ও রাজনৈতিক বক্তব্য পেশ করতে হবে। তাদেরকে যেমন নামাযের ইমামতীর যোগ্য হতে হবে তেমনি জনগণের অভাব অভিযোগের প্রতিকারেও নেতৃত্ব দিতে হবে। তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও চালচলন এমন হতে হবে এবং তাদের কিরাআত এতটা শুদ্ধ হতে হবে যেন জনগণ তাদেরকে নামাযে ইমামতী করার

জন্য আবদার জানায়। তেমনিভাবে স্থানীয় সমস্যা ও অভাব অভিযোগের ব্যাপারে তাদেরকে এতটা সোচ্চার ও সক্রিয় হতে হবে যাতে এলাকাবাসী তাদের নিকট ভীড় করা প্রয়োজন বোধ করে।

২। এলাকার মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও জনসেবামূলক কাজে এবং নৈতিক ও সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ করার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালনের মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয় তা জননেতার দায়িত্ব পালনের জন্য অপরিহার্য। সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করে এসব কাজে সময়, শ্রম ও চিন্তা ব্যয় করা সহজসাধ্য নয়। কিন্তু রুকনদের মযবুত টীম গড়ে তুলতে পারলে সাংগঠনিক দায়িত্ব বণ্টন করে সময় বের করা অসম্ভব নয়। সামাজিক কাজে যাদের স্বাভাবিক আগ্রহ আছে তাদের উপরও বিভিন্ন দায়িত্ব বণ্টন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে আমরা অনেক পেছনে রয়েছি। অথচ এ ময়দানে সক্রিয় না হলে জনগণের নিকট নেতৃত্বের মর্যাদা পাওয়া সম্ভব নয়।

৩। জামায়াতের পার্শ্বসংগঠন সমূহকে এলাকায় সক্রিয় করার মাধ্যমেও স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলা যায়।

৪। জামায়াতের সমাজ সেবামূলক কার্যক্রমকে এলাকায় সম্প্রসারিত করার মাধ্যমেই স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে উঠতে পারে।

মূল সংগঠনের নেতৃত্বের অধীনে এ সব কাজ পরিচালিত হলে এ ধরনের স্থানীয় নেতৃত্ব জামায়াতের মূল নেতৃত্বকে শক্তিশালী করবে এবং জনগণ জামায়াতের নেতৃত্বের পেছনে সংঘবদ্ধ হবে।

রুকনিয়াতের দায়িত্ববোধে সংকট

রুকনদের কারো কারো মধ্যে মাঝে মাঝে দায়িত্ববোধের অভাব দেখা দেয়। মানুষের দেহে যেমন রোগ হয়, দ্বীনি জিন্দেগীতেও রোগ দেখা দেয়া অস্বাভাবিক নয়। যার রোগ হয় সে চিকিৎসার উদ্যোগ না নিলেও অন্য লোকের কর্তব্য তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা। অসুখ হলে নিকট আত্মীয়রাই চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকে।

তেমনিভাবে যখন রুকনদের মধ্যে সাংগঠনিক বা দ্বীনি দৃষ্টিতে ত্রুটি দেখা যায় তখন দরদের সাথে তার চিকিৎসার চেষ্টা করা জামায়াতের অন্যান্য

রুকনদেরই কর্তব্য। কারণ সংগঠনের পরিবারে রুকনগণ পরস্পর ঘনিষ্ঠ দ্বীনি আত্মীয়। এটা সত্যিই জামায়াতী জিন্দেগীর বিরাট নিয়ামত যে রুকনিয়াতের দায়িত্ববোধে কারো সংকট দেখা দিলে সংগঠনের পক্ষ থেকে তাকে সে সংকট থেকে উদ্ধার করার জন্য চেষ্টা করা হয়। আন্দোলন ও সংগঠনের ব্যাপারে যাদের আন্তরিকতা বহাল থাকে অর্থাৎ যারা রুকনিয়াতের শপথে যে ইকামাতে দ্বীনকেই জীবনের প্রধান লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল সে কথা ভুলে যাননি তাদেরকে সহজেই আবার দায়িত্ব-সচেতন করা যায়। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক জীবনের ঐ মহান উদ্দেশ্যকে যারা দুনিয়া বানাবার চেয়ে বড় মনে করা অব্যাহত রাখতে ব্যর্থ হন তাদেরকে কোন ক্রমেই আর পূর্বের মতো সক্রিয় করা সম্ভব হয় না।

আমার নিকট এটা সত্যিই বিস্ময়কর ও রহস্যজনক মনে হয় যে যারা একবার ভালভাবে বুঝে শুনেই এ পথে এলেন এবং বিভিন্ন স্তরে দায়িত্ব পালন করলেন তারা কী করে এ পথ ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে দিব্যি দুনিয়ার দায়িত্ব পালন করতে পারেন। তারা তাদের বিবেককে কীভাবে শান্ত করেন তা আমার বুঝে আসে না।

দ্বীনের দায়িত্ব যতটুকু বুঝে আসলে একজন বুঝমান লোক রুকনিয়াতের শপথ নিতে সাহস করেন তার পক্ষে সুস্থ মনে এ দায়িত্ব ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করা কীভাবে সম্ভব হয় সে কথা চিন্তা করে আমি কোন সন্তোষজনক জওয়াব যোগাড় করতে পারিনি। এ চিন্তা শেষ পর্যন্ত আমাকে এ সিদ্ধান্তেই পৌঁছে দিয়েছে যে হেদায়াতের ইখতিয়ার যে আল্লাহর হাতে তিনি যে কোন সময় কাউকে কোন কারণে হেদায়াতের নিয়ামত থেকে মাহরূম করে নিতে পারেন। আল্লাহ পাক সম্ভবত এ কারণেই এমন এক দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন যা হেদায়াত পাওয়ার পর হেদায়াতের উপর কায়েম থাকার চেষ্টা অব্যাহত রাখার তাকিদ দেয়। সে দোয়াটি হলো ঃ

رَبَّنَا لَاتُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ .

সূরা আলে ইমরানের ৮নং আয়াতে উল্লেখিত দোয়াটি অর্থ বুঝে আমাদের সবারই নিয়মিত পড়া দরকার। এর অর্থ হলো- "হে আমাদের প্রভু, তুমিই যখন আমাদের হেদায়াত করেছ তখন এ হেদায়াত দেবার পর আমাদের

দিলে কোন প্রকার বক্রতা সৃষ্টি হতে দিও না। তোমার দয়ার ভাণ্ডার থেকে আমাদের উপর রহমত নাযিল কর। একমাত্র তুমিই প্রকৃত দাতা।"

আল্লাহর এ পথ যেমন সরল ও সোজা তেমনি এ পথ থেকে বিচ্যুত হওয়াও কঠিন নয়। এ পথে বাধারও অন্ত নেই। একটু অমনোযোগী হলেই সরল পথ থেকে সামান্য এদিক সেদিক হয়ে যাবার আশংকা রয়েছে। সব রকম বিচ্যুতি থেকে বাঁচার একমাত্র নিশ্চিত গ্যারান্টি হলো জামায়াতী জিন্দেগী। সংগঠনের কেউ পথ থেকে সামান্য সরে গেলে অন্য সবাই তাকে আবার পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। তাই সংগঠনের আনুগত্যই বাঁচার নিশ্চিত উপায়।

একমাত্র একটি কারণেই এ জামায়াতের রুকনিয়াতের দায়িত্ব ত্যাগ করা জায়েয হতে পারে। যে উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামীর রুকনিয়াত কবুল করা হয়েছিল, যদি সে উদ্দেশ্য আরও ভালভাবে হাসিল করার মতো উন্নততর কোন দ্বীনি সংগঠনের রুকন হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায় তাহলে এ দায়িত্ব ত্যাগ করা দোষণীয় হবে না। এ অবস্থাকে দায়িত্ব ত্যাগ করা বলা চলে না। এতে সংগঠন বদল করে দায়িত্ব স্থানান্তর করা হলো মাত্র। কিন্তু কোন অজুহাত খাড়া করে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করার চেষ্টা করা ঈমানের জন্য নিঃসন্দেহে মারাত্মক।

জামায়াতের সম্মেলনে যোগদানের দায়িত্ব

রুকনিয়াতের দায়িত্ব আলোচনার শেষ পর্যায়ে এমন একটি বিরাট দায়িত্বের উল্লেখ করছি যার গুরুত্বের চেতনা সবার মধ্যে সন্তোষজনক পরিমাণ পাওয়া যায় না। সে দায়িত্ব হলো সম্মেলনের ডাকে সাড়া দেবার দায়িত্ব। কেন্দ্রীয় সম্মেলনই হোক, আর জিলা, থানা বা স্থানীয় পর্যায়ের সম্মেলন বা বৈঠকই হোক এসবে যোগদান করার গুরুত্বকে ছোট করে দেখার উপায় নেই।

১৯৪৬ সালে মাত্র ৪ মাসের ব্যবধানে দুটো কেন্দ্রীয় রুকন সম্মেলন ডাকা হয়েছিল। দ্বিতীয় সম্মেলনে কিছু সংখ্যাক রুকন উপস্থিত না হয়ে চিঠি লিখে জানালেন যে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের তাকীদে তারা যেতে পারলেন না। যেহেতু অল্প দিন আগেই এক সম্মেলন হয়ে গিয়েছে তাই এ সম্মেলনে না গেলেও চলতে পারে বলে তারা মনে করেছেন। তবে সম্মেলনে যে সিদ্ধান্তই হয় তা তারা মেনে চলার ওয়াদা করলেন।

আমীরে জামায়াত মাওলানা মওদূদী (র.) তাদের চিঠির উল্লেখ করে সম্মেলনে মন্তব্য করলেন যে এ ভাইয়েরা রুকনিয়াতের দায়িত্ববোধের অভাবেই সম্মেলনে যোগদানের চেয়ে ব্যক্তিগত প্রয়োজনকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে ফেললেন। যদি এ সম্মেলন কোন আলোচনা ছাড়াই সমাপ্ত করা হতো তবুও তাদের আসা উচিত ছিল। একমাত্র তারাই রুকন গণ্য হবার যোগ্য যারা জামায়াতের ডাকে সাড়া দেয়। ডাক দেয়া সত্ত্বেও যারা শরয়ী ওযর ছাড়া সাড়া দেয় না তাদের রুকন হওয়া অর্থহীন। সামরিক বাহিনীতে কখনও কখনও হঠাৎ করে এমন ধরনের বিউগল বাজান হয় যখন সবাইকে নির্দিষ্ট স্থানে হাজির হয়ে যেতে হয়। যে যে অবস্থায় থাকে তাকে সে অবস্থায়ই অবিলম্বে হাজির হয়ে আনুগত্যের প্রমাণ দিতে হয়। তেমনিভাবে জামায়াতের যে কোন ডাকে যারা সাড়া দিল না তারা আনুগত্যের পরিচয় দিতেই ব্যর্থ হলো। এ মনোভাব রুকনের জন্য সাজে না। জামায়াত তাদেরকেই রুকন গণ্য করবে যাদের উপর এ ভরসা করা যায় যে যখনই ডাক দেয়া হবে তখনই আর সব দায়িত্ব ফেলে চলে আসবে। তা না হলে জামায়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই যে তার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য সে কথা কী করে প্রমাণ হবে? রুকনিয়াতের শপথের দাবী এ মনোভাব ছাড়া পূরণ হতে পারে না।

কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন যে সম্মেলনে যোগদান করার চাইতে বড় কোন দ্বীনি খেদমতে নিযুক্ত থাকলে বৈঠকাদিতে অনুপস্থিত থাকা জায়েয হবে কি না ?

দায়িত্বশীলের নিকট ওযর পেশ করে অনুপস্থিত থাকার অনুমতি না নিয়ে বিনা নোটিশে অনুপস্থিত থাকা জায়েয হতে পারে না। এটা বাইয়াতের স্পিরিটেরই খেলাফ।

নামাজের উদাহরণ থেকে এ প্রশ্নের সঠিক জওয়াব পাওয়া যায়। নামায একাও পড়া সম্ভব। বরং আল্লাহর সাথে বান্দাই গভীর সম্পর্কের জন্য তাহাজ্জুদে একা গোপনে নামায আদায় করারই ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু জামায়াতী জিন্দেগীর অগণিত প্রয়োজনে আল্লাহ পাক নির্দিষ্ট সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ ব্যবস্থায় দ্বীনের বড় কোন খেদমতের অজুহাত দিয়ে জামায়াত তরক করা জায়েয হবে কি? এটা এজন্যই জায়েয হবে না যে আল্লাহর নির্দেশ পালন করার

চাইতে বড় কোন দ্বীনি খেদমত হতে পারে না। তেমনিভাবে ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে যে জামায়াতের আনুগত্যের শপথ নেয়া হয়েছে সে জামায়াতের মারূফ নির্দেশ পালন করার চাইতে বড় কোন দ্বীনি খেদমত হতে পারে না। এ কথা যদি বুঝে আসে তাহলে সংগঠনের স্থানীয় বৈঠকগুলোতেও শরয়ী ওযর ছাড়া অনুপস্থিত থাকা জায়েয নয়। আর শরয়ী ওযর বলতে ঐ সব ওযর বুঝায় যার দরুন জুময়ার জামায়াতের ফরযিয়াত সাকেত হয়ে যায়।

জামায়াতের এ কেন্দ্রীয় সম্মেলনে যোগদানের গুরুত্ব সম্পর্কে আমি এখানে আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি না। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় রুকন সম্মেলন যে সংগঠনের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী সে কথা আপনাদের সবারই ভালভাবে জানা আছে। আমার ধারণা যে অবহেলা করে কোন রুকন এ সম্মেলন থেকে অনুপস্থিত নেই। যদি কেউ বিনা কারণে এ সম্মেলনে না আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তাহলে তিনি জামায়াতের রুকন না থাকারই ফায়সালা করে থাকবেন।

আল্লাহ পাক আমাদের এ সম্মেলন কবুল করুন এবং সব অবস্থায় রুকনিয়াতের দায়িত্ব যথাযথরূপে পালন করার তাওফীক দান করুন, যাতে আমরা পরবর্তীদের জন্য আদর্শ গণ্য হতে পারি এবং আদালতে আখিরাতে আমাদের মহান প্রভুর সন্তুষ্টি ও আমাদের আদর্শ নেতা রাসূল (স.) এর শাফায়াতের ভাগী হতে পারি। আমীন! সুম্মা আমীন!

রুকনদের টারগেট সম্পর্কে আমীরে জামায়াতের ভাষণ

জামায়াতে ইসলামীর রুকনগণের উপর যে বিরাট দ্বীনি দায়িত্ব রয়েছে তা যোগ্যতার সাথে পালন করতে হলে তাদেরকে নিম্ন বর্ণিত দশটি* টারগেট হাসিল করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

১. আল্লাহ্ পাকের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অন্তরে অনুভব করা

ইসলামী আন্দোলনকে যারা দুনিয়ার জীবনের প্রধান কর্মসূচি হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাদের জন্য এ পথের আসল পাথেয়ই হলো আল্লাহ্ তায়ালার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এ পথটা এমন অনিশ্চিত যে, যে কোন সময় বিনা বিচারে জেলে আটকে থাকতে হতে পারে। ইসলাম বিরোধী সন্ত্রাসবাদীদের হাতে যে কোন সময় শহীদ বা আহত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কঠোরভাবে হালাল পথে চলার দরুন আর্থিক অনটনে পেরেশানী আসতে পারে। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের যারা ইসলামী আন্দোলনে শরীক হয়নি তাদের থেকে ওসব আপদ বিপদে তেমন সাহায্য সহানুভূতি পাওয়ার আশা করা যায় না। এমনকি বয়স্ক সন্তানদের যারা এ পথের পথিক নয় তাঁরাও আন্তরিক সহানুভূতির পরিবর্তে এসব বিপদ টেনে আনার দরুন ক্ষোভ প্রকাশ করতে পার এবং এ পথ ত্যাগ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

আল্লাহ্ তায়ালার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অনুভব করা ছাড়া এ জাতীয় পরিস্থিতিতে চরম অসহায় বোধ হওয়াই স্বাভাবিক। অথচ সব সময়ই আল্লাহ্ পাক সহায় রয়েছেন। কোন বিপদই তাঁর অনুমতি ছাড়া আসতে পারে না। এ পথে চলার যোগ্যতা যাচাই করার জন্যই তিনি যাকে যেভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন তাকে সেভাবেই করে থাকেন। যারা আল্লাহ্ পাকের নিকট নিজেদের জান-মাল

* সম্মেলনে ভাষণ দেবার সময় ৭টি টারগেটের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। পরে আরও ৩টি যোগ করা হয়েছে এবং কথাগুলোকে সাজিয়ে তা বর্ধিত আকারে এখানে পেশ করা হয়েছে।

বেহেশতের বিনিময়ে খুশী মনে বিক্রয় করেছেন তারা যে কোন পরীক্ষার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকেন। বরং প্রতিটি পরীক্ষায় তারা মহান মনিবের সাথে ঘনিষ্ঠতর হয়েছেন বলে অনুভব করেন।

পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জেলের উঁচু দেয়ালের ভেতরে যখন আবদ্ধ হতে হয় তখন একমাত্র আল্লাহকে অতি নিকটে পাওয়ার অনুভূতি সৃষ্টি হয়। প্রকৃত অবস্থা এটাই যে দুনিয়ার সব সহায় থেকে বঞ্চিত হলেই আল্লাহকে একমাত্র সহায় হিসাবে কাছে পাওয়া যায়। সূরা হা-মীম আস-সাজদার ৩০ নং আয়াতে একথাই বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلاَّ تَخَافُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ .

“নিশ্চয়ই যারা আল্লাহকেই একমাত্র রব হিসাবে ঘোষণা করার পর একথার উপর মযবুত হয়ে থাকে, আল্লাহর ফেরেশতারা তাদের উপর নাযিল হয়ে (তাদের অন্তরে সান্ত্বনা দেবার জন্য) বলে, “তোমরা ভয় পেয়ো না ও ঘাবড়ে যেও না, বরং ঐ জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর যার ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হয়েছে।”

ইসলামী আন্দোলনের পথে যে কোন কঠিন পরীক্ষা আসতে পারে বলে যারা মন-মগজে আগে থেকেই প্রস্তুত থাকে না তারা সমান্য বিপদেই দিশেহারা হয় এবং এ পথ থেকে পালাবার ফিক্‌র করে।

আল্লাহর দ্বীনকে কায়েমের জন্য বিপদের ঝুঁকি নিয়ে যারা এগিয়ে চলে তারা অবশ্যই মনিবের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অন্তরে গভীরভাবে অনুভব করে। এ পথে যে দায়িত্ব আসে তা পালন করতে গিয়ে প্রতি পদে পদে তাঁর সাহায্য চাইতে হয়, কাতরভাবে তাঁর দুয়ারে ধরনা দিতে হয়, তাঁর কাছে মনের কবাট খুলে কথা বলতে হয়। তিনি আমার সাথেই আছেন একথা অনুভব না করলে কি এমনটা করা যায়? তিনি তো সবারই সাথে আছেন। কিন্তু সবাই এ অনুভূতি রাখে না যে তিনি সাথেই আছেন। সবাই এ চেতনা বোধ করে না। ইসলামী আন্দোলনে যে যত বেশী একাগ্র হয় তার অন্তরে এ অনুভূতি ততই গভীর হয়।

২. রুকনিয়াতের হাইসিয়াত সম্পর্কে সজাগ থাকা

যে রুকন 'রুকন' হিসাবে তার মর্যাদা ও পজিশন সম্পর্কে সব সময় সজাগ ও সচেতন থাকেন তার পক্ষে রুকনিয়াতের মান উন্নত করা সহজ হয়।

রুকনিয়াতের দায়িত্ব সম্পর্কে চেতনা থাকলে এমন কোন কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয় যা একজন রুকনের পক্ষে করা মোটেই সাজে না বলে তিনি জানেন। এমনিতে তো প্রত্যেক ঈমানদারেরই অভিজ্ঞতা আছে যে আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজের বেলায় তার বিবেকে বাধে। তবু কোন কোন সময় বিবেকের বাধা উপেক্ষা করা হয়। কিন্তু যিনি রুকন তিনি বিবেকের আপত্তি জানাবার সাথে সাথেই ঐ কাজ পরিহার করবেন। তিনি ভাববেন যে রুকন হয়ে এ কাজ কী করে করতে পারি?*

বাঘ নাকি মৃত পশু খায় না। নিজের শিকার করা জীবই সে খায়। এটাই তার মর্যাদা। কিন্তু কোন বাঘ যদি শেয়ালের পরিবেশে পড়ে শেয়ালের সাথে মৃত পশু খায় তাহলে বুঝতে হবে যে, সে যে বাঘ সে চেতনা সে হারিয়ে ফেলেছে। তেমনি কোন রুকন রুকনিয়াতের চেতনা না হারালে এমন কাজ করতে পারে না যা রুকনের জন্য শোভনীয় নয়।

তাই রুকন যখন আত্মসমালোচনা করবেন তখন রুনিয়াতের উচ্চ মানকে সামনে রেখেই নিজের হিসাব নেবেন। কর্মীদের সাধারণ মানে হিসাব নিলে রুকনিয়াতের মান বাড়তে পারে না। যার দায়িত্ব যত বড় তাকে তত উচ্চ মানেই আত্মসমালোচনা করতে হবে।

এ বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো রুকনকে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে " আমার বিবেকের বিরুদ্ধে কিছুতেই চলব না।" যদি কোন দুর্বলতার দরুন বিবেকের রায়কে উপেক্ষা করা হয়ে যায় তাহলে নফল নামায, রোযা ও বাইতুল মালে ইয়ানাত দিয়ে জরিমানা আদায় করার ব্যবস্থা করতে হবে। নফসকে ঢিলা দিলে সে আরও ঢিলা হতে থাকে। তাই তাকে খাতির করা চলবে না, শক্ত হাতে তাকে ধরতে হবে।

৩. ইতায়াতে আমীরের হক আদায় করা

সংগঠনের নিম্নতম স্তর থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় জামায়াত পর্যন্ত যারা ইমারাতের দায়িত্বে রয়েছেন তাদের সকল মারূফ হুকুম অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে

* এ বিষয়ে মাও. মওদূদী (র.) 'হেদায়াত' পুস্তিকাটিতে অত্যন্ত বাস্তব পরামর্শ দান করেছেন।

পালন করতে হবে। রাসূল (স.) বলেছেন, "যে আমীরের আনুগত্য করল সে আমারই আনুগত্য করেছে।" 'উলুল আমর' এর আনুগত্য করার নির্দেশ আল্লাহ স্বয়ং দিয়েছেন।

মাসজিদের ইমামকে জামায়াতে নামায আদায় করার সময় যেমন রাসূলের নায়েব মনে করে তার আনুগত্য করতে হয়, আমীরকে সেভাবেই মেনে চলা উচিত। আমীরের হুকুম যদি শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিকর না হয় তাহলে কোন প্রকার ওযর আপত্তি না তুলে তা পালন করলে তবেই ইতায়াতের হক আদায় হয়। ওযর পেশ করা মুনাফেকীর লক্ষণ বলেও কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য শরয়ী ওযর থাকলে তা নিশ্চিন্তে পেশ করা যায়। কিন্তু পার্থিব অসুবিধা ও ক্ষতির দরুন সহজে ওযর পেশ করা উচিত নয়। আর পেশ করার সময় যেন এ মনোভাব প্রকাশ পায় যে ওযর কবুল না করলেও অসন্তুষ্ট হবে না। আশা করা যায় যে আমীর ওযর জানার পর অবিবেচকের মতো হুকুম চালাবেন না।

যে রুকন হক আদায় করে আনুগত্য করবেন তিনি যখন নিজে ইমারাতের দায়িত্বে আসবেন তখন তিনি অন্যদের আনুগত্য পাওয়ার যোগ্য হবেন। ওযর পেশ করার দুর্বলতা ত্যাগ করে আমীরের হুকুম পালন করাই হলো ইতায়াতের দাবী। এটাই আযীমতের পথ। আর আল্লাহ তাদেরই খাসভাবে সাহায্য করেন এবং তাদের ওযর দূর করে দেন। আল্লাহ হয়তো পরীক্ষা করার জন্যই ওযর সৃষ্টি করেন। এটাকে পরীক্ষা মনে করলে ওযরের পরওয়া করবেন না। পরওয়া করলে মনে করতে হবে যে পরীক্ষায় ফেল করেছেন। আল্লাহ পরীক্ষা করলেন, অথচ এটাকেই ওযর মনে করে পিছিয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিলে পরীক্ষায় পাস করা কখনও সম্ভব না।

৪. জামায়াতের সিদ্ধান্তকে সর্বাবস্থায় মেনে নেয়া

কোন বিষয়ে জামায়াতের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্বশীল সংস্থা যখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন সকল রুকনকেই খোলা মনে তা মেনে নিতে হবে। যদি কোন সিদ্ধান্তকে কোন রুকন সঠিক মনে না করেন তাহলে গঠনতান্ত্রিক উপায়ে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের চেষ্টা করবেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত

পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত তা মেনে চলতে হবে। তা না হলে জামায়াতের আনুগত্য বা বাইয়াতের খেলাফ হবে।

প্রয়োজন মনে করলে উর্ধ্বতন জামায়াতের নিকট কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করা যাবে। কিন্তু সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে কাজ করে যেতে হবে। এটা জামায়াতের সুস্থতা ও শৃংখলার দাবী। এ ব্যাপারে কারো ব্যক্তিগত মতকে জামায়াতের উপরে স্থান দেয়া চলে না। শরীয়তের বিচারে যদি কোন সিদ্ধান্ত আপত্তিকর বিবেচিত না হয় তাহলে জামায়াতের সিদ্ধান্তের পক্ষে ব্যক্তিগত মত কুরবানী করতে সহজেই রাযী হওয়া উচিত। তা না হলে রুকনিয়াতের মর্যাদা থাকে না।

৫. মেজায ঠাণ্ডা রেখে চলার মযবুত সিদ্ধান্ত নেয়া

মেজায গরম করে কথা বললে ভদ্র আচরণের সীমা ঠিক থাকতে পারে না। রাগ উঠা অস্বাভাবিক নয়। মেজায গরম হয়ে গেলে মেজায ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকার পরামর্শই রাসূল (স.) দিয়েছেন। এ কাজটি সত্যিই কঠিন। তাই রাসূল (স.) বলেছেন, "পাহলোয়ান ঐ ব্যক্তি নয় যে কাউকে কুস্তিতে কাবু করে। ঐ ব্যক্তিই সত্যিকার বীর যে রাগ দমন করতে পারে।"

আমাদের সংগঠনে আল্লাহর রহমতে অন্যান্য দলের মতো নেতৃত্বের কোন্দল, উপদলের সংঘর্ষ বা কর্মীদের মধ্যে হাতাহাতি, মারামারি ও গালাগালি হয় না। এ সত্ত্বেও আমীর ও মামূরের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা সৃষ্টি হয় তা প্রধানত কড়া মেজাযের কারণেই হয়ে থাকে। যত সাংগঠনিক সমস্যা সৃষ্টি হয় তার মধ্যে বেশী ক্ষেত্রেই মেজায দায়ী বলে দেখা যায়।

আমাদের সংগঠনে আইনের শাসন চলে না। নৈতিক শাসনই এখানে সম্ভব। আমরা একে অপরকে দ্বীনের ভিত্তিতেই মেনে চলি। যদি কেউ মানতে রাযী না হয় তাহলে তাকে গ্রেফতার করা বা জেলে দেবার তো কোন সুযোগই নেই। তাই ধমক দিয়ে মানতে বাধ্য করার চেষ্টা করা যায়। কিন্তু ধমকে মানতে বাধ্য হবে কেন? না মানলে কী করা যাবে? আইনের শক্তি বলতে একমাত্র গঠনতন্ত্র। যদি কেউ গঠনতন্ত্রের দৃষ্টিতে দোষী হয় এবং সংশোধনের চেষ্টা সফল না হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

গ্রহণ করার সময়ও দরদের পরিচয় দেয়া উচিত। মেজায দেখাবার সুযোগই কোথায়, আর তাতে সুফলই বা কী?

আমরা যদি দৃঢ়ভাবে এ সিদ্ধান্ত নেই যে কোন অবস্থায়ই মেজায দেখিয়ে কথা বলব না এবং রাগ উঠলে রাগের মাথায় কথা বলব না, তাহলে সাংগঠনিক সমস্যা অনেক কমে যাবে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে কেউ ঝগড়া করার উদ্দেশ্যে বা বিরোধিতার উদ্দেশ্যে আক্রমণাত্মক ভাষায় কথা বললেও শান্তভাবে জওয়াব দিয়ে তাকে পরাজিত করা সহজ হয়।

৬. পরিবারস্থ লোকদেরকে সংগঠনে সক্রিয় করা

কোন রুকনের স্ত্রী ও সন্তানাদি যদি ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় না হয় তাহলে ঐ পরিবারে তিনি সন্তোষজনক পরিবেশ পাবেন না। যে কাজকে তিনি ফরয মনে করে করছেন সে কাজে পরিবারের কেউ উৎসাহী না হলে তিনি কী করে তার উপর সন্তুষ্ট থাকবেন? পবিারের কেউ যদি এ কাজ অপছন্দ করে তাহলে তা অশান্তির কারণই ঘটবে। সন্তান যদি ভিন্ন মতবাদে সক্রিয় হয় তাহলে তো সংঘর্ষ সৃষ্টি হওয়ারই আশংকা রয়েছে।

বিশেষ করে স্ত্রী যদি আন্দোলনে সক্রিয় না হয় তাহলে সকল সময় তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। সাংগঠনিক কারণে বেশী রাতে বাড়ী ফিরতে হলে স্ত্রীকে যদি গাল ফুলানো অবস্থায় দেখা যায় বা শীতের রাতে স্ত্রীকে ঘুমন্ত দেখে নিজেকেই ঠাণ্ডা খাবার খেতে বাধ্য হতে হয় তাহলে এ অবস্থাটা নিশ্চয়ই সুখপ্রদ নয়।

বড় কথা হলো, যে রুকনের স্ত্রী ও সন্তানাদিই এ পথের পথিক নয় তার দাওয়াত প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের নিকট কী প্রভাব সৃষ্টি করবে? দায়ী ইলাল্লাহ হিসাবে যার নৈতিক ও চারিত্রিক প্রভাব তার পরিবারের উপরই পড়ে না, তিনি রুকনিয়াতের দায়িত্ব কিভাবে পালন করবেন? তাই পরিবারের সকল সদস্যই যাতে জামায়াতের রুকন হয় বা ইসলামী ছাত্রশিবির বা ইসলামী ছাত্রীসংস্থার সদস্য হয় সে জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। এর জন্য নিয়মিত পারিবারিক বৈঠকও যথেষ্ট নয়। এ সব কয়টি সংগঠনের লোকদেরকে আমাদের পরিবারের সদস্যদেরকে টারগেট করে কাজ করার অনুরোধ জানাতে হবে। এভাবে ভেতর ও বাইরের সমবেত চেষ্টা ছাড়া এ উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না।

প্রত্যেক রুকনকেই গভীরভাবে ভাবতে হবে যে আল্লাহর দ্বীনের যে মহান পথে চলার সিদ্ধান্ত নিলাম যদি মৃত্যুর সময় প্রিয়তমা স্ত্রী ও স্নেহভাজন সন্তানদেরকে এ পথের পথিক দেখে যেতে না পারি তাহলে আন্দোলনের জীবনের সার্থকতা কোথায়? তাদেরকে জান্নাতের পথে চলমান দেখে মরতে পারলেই না জীবন সার্থক হবে এবং মরণের পরও আমল জারী থাকবে।

এ ব্যাপারে অনেককেই অবহেলার করতে দেখা যায়। মহব্বত, শাসন, সোহাগ, আবেগ, চাপ দেয়া ইত্যাদি সব রকম পন্থা প্রয়োগ করে এ ব্যাপারে সফল হবার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এ ব্যাপারে ঢিলা দিলে ব্যর্থতাই কপালে জুটবে। এ কারণেই ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হবার সাথে সাথেই পয়লা জীবন-সাথী হিসাবে স্ত্রীকে সক্রিয় করতে হবে। তাহলে উভয়ের চেষ্টার সন্তানাদিকে পথে আনা অধিকতর সহজ হবে।

৭. ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দেরকে জান্নাতের পথ দেখানো

প্রত্যেক রুকনকে এভাবে বিবেচনা করতে হবে যে আমার আত্মীয়রে মধ্যে যাদের আপদ-বিপদে আমি অস্থির হই, যারা অসুস্থ হলে পেরেশান হয়ে দেখতে যাই, যারা মারা গেলে চোখে পানি আসে তারা দোযখে যাক এ কামনা আমরা নিশ্চয়ই করি না। কিন্তু তারা জান্নাতে যেন যায় সে কামনা কি করা কর্তব্য নয়? জান্নাতের যে পথ আল্লাহর কোন বান্দার চেষ্টায় আমি চিনলাম সে পথ আমার আপনজন ও মহব্বতের লোকদেরকে না দেখালে আত্মীয়তার দায়িত্ব কি পালন হতে পারে?

কুরআন পাকের সূরা আশ-শুয়ারার ২১৪ নং আয়াতে রাসূল (স.) কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে "আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন।" আত্মীয়তার সম্পর্কটা এমন যে সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে তাদের সাথে হামেশাই উঠা-বসা করতে হয়। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখার উপরও কুরআন ও সুন্নাহতে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যেসব আত্মীয় বেদ্বীন তাদের প্রতি মহব্বতের মাত্রা কম হলেও কোন না কোন পর্যায়ে সম্পর্ক রাখতেই হয়। তাই দ্বীনের দাওয়াতের মাধ্যমে সব আত্মীয়ের সাথেই সম্পর্ক রাখতে হবে। দরদের সাথে দাওয়াত পেশ করলে সুফলের আশা অবশ্যই করা যায়।

৮. সমাজের নিকট দ্বীনের শিক্ষকের মর্যাদা অর্জন

যারা দীর্ঘদিনের চেষ্টা সাধনার পর রুকন হয়েছেন তাদের কি দ্বীন সম্পর্কে পূর্বে সঠিক ধারণা ছিল? ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় হবার ফলে বহু পড়া-শুনা ও ট্রেনিং নেবার সুযোগ পাওয়ার ফলেই এ পথ চিনতে পারা গেল। তাহলে যারা এ পথে এখনও আসেনি তারা দ্বীন সম্পর্কে বিশুদ্ধ ধারণা কোথায় পাবে? এমনকি সাধারণ আলেম সমাজের নিকট থেকে ইসলামের ধর্মীয় দিকের ধারণা পেলেও ইসলামের সত্যিকার পরিচয় পাওয়ার সুযোগ অনেকেই পায় না।

আধুনিক শিক্ষিত লোকেরা যখন আমাদের কাছ থেকে ইসলামের সামগ্রিক রূপ সম্পর্কে আভাস পায় তখন তারা নিশ্চিত হয়ে বলে যে জীবন বিধান হিসাবে ইসলামের এ ধারণা এদ্দিন কেন পেলামনা?

এ অবস্থায় আমাদের চারপাশে আল্লাহর যে বান্দারা রয়েছে তারা আমাদেরকে ছাড়া কিভাবে দ্বীনের সঠিক ধারণা পাবে? তাই দ্বীনের উস্তাদের মহান দায়িত্ব আমাদেরকেই পালন করতে হবে। কিন্তু শুধু আমাদের মুখে দ্বীনের কিছু ইলম শুনেই মানুষ এ পথে এগিয়ে আসবে না। আমরা যারা এ পথে আছি তাদের লেবাস-পোষাক, বাহ্যিক চাল-চলন থেকে শুরু করে লেন-দেন, ওয়াদা-পালন, আচার ব্যবহার ও গোটা চরিত্র পর্যন্ত মানুষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করবে। আমরা মুখে এ দ্বীনের প্রচার করছি আমাদের জীবনে যদি এর বাস্তব নমুনা তারা দেখতে পায়, তবেই তারা এ পথে আকৃষ্ট হবে।

তাই সমাজের নিকট দ্বীনের শিক্ষক হিসাবে আমাদের মর্যাদা হতে হবে। মানুষ যখন আমাদের দ্বীনি চরিত্রের উন্নত মান দেখতে পাবে তখন তারা নিজেদের মধ্যে চর্চা করবে যে জামায়াতের রুকন এমনই হয়ে থাকে। মানুষ নিজেরা যত দোষেই দোষী থাকুক, উন্নত গুণের মানুষকে প্রশংসা না করে পারে না। জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত তখনই সাফল্যের প্রমাণ দেবে যখন এর রুকনগণের মানবিক গুণ সমাজে স্বীকৃতি পাবে।

কোন এলাকায় যদি জামায়াতের একজন রুকন বসবাস করেন তাহলে সে এলাকার লোকদের মুখে এ চর্চা হওয়ারই কথা যে এ লোকের চরিত্রে যে উন্নতি দেখা যাচ্ছে তা আগে ছিল না। জামায়াতে ইসলামীতে গিয়েই তার এ পরিবর্তন হয়েছে। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরামের চারিত্রিক পরিবর্তন রাসূল (স.) এর সত্যতার প্রমাণ হিসাবে কুরআনে পেশ করা হয়েছে।

৯. দায়িত্বশীল হিসাবে সাথীদের গড়ে তোলা

যারা রুকন তাদের কাঁধে সংগঠনের পক্ষ থেকে ছোট-বড় কোন না কোন দায়িত্বের বোঝা অবশ্যই তুলে দেয়া হয়। যারা কোন না কোন কারণে 'মাযূর' তাদের কথা আলাদা। যে দায়িত্বই কোন রুকনের উপর দেয়া হয় তা একা পালন করা যায় না। সংগঠনের কতক সহকর্মীকে নিয়েই সে দায়িত্ব পালন করতে হয়। শুধু নিজের উপর দেয়া কাজটুকু করে যাওয়াই দায়িত্বশীলের পরিচায়ক নয়। সহকর্মী ও সংগী-সাথীদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়ার যোগ্যতা না থাকলে দায়িত্ব পালন হয় না। একা কোন কাজ সম্পন্ন করা যায় না। যাদের সহযোগিতা নিয়ে কাজটা আনজাম দিতে হবে তাদেরকে পরামর্শে শরীক করে এবং বিভিন্ন লোকের যোগ্যতা অনুযায়ী দায়িত্ব বণ্টন করে দায়িত্বশীল যখন সবার কাজের তদারক করেন তখন একসাথে দুটো কাজ হয়ে যায়। একদিকে নির্দিষ্ট কাজটুকু সম্পন্ন হয়, অপরদিকে সংগঠনের সবাই কাজের যোগ্য হিসাবে গড়ে উঠে।

আদর্শ দায়িত্বশীল ঐ ব্যক্তি তার সহকর্মীদের মধ্য থেকে এমন লোক তৈরী করতে সক্ষম হন যিনি এ দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য। তবেই উর্ধ্বতন সংগঠন তার দায়িত্ব আর একজনের উপর দিয়ে তাকে বৃহত্তর জায়গায় কোন দায়িত্ব দিতে পারে। এভাবে একজনের জায়গায় আরও কয়েকজন তৈরী হতে না থাকলে বলিষ্ঠ সংগঠন গড়ে উঠতে পারে না।

১০. এলাকার সম্ভাবনাময় লোকদেরকে টারগেট করা

যার উপর যেটুকু এলাকার দায়িত্ব সে গোটা এলাকার প্রতিই তার লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। জিলা আমীরের এলাকা গোটা জিলা। এভাবেই সরকারী থানা, সাংগঠনিক থানা, পৌরসভা, ইউনিয়ন, ইত্যাদি এলাকার দায়িত্ব যাদের উপর দেয়া হয় তারা তার সবটুকু এলাকার জন্যই দায়িত্বশীল।

নিজ এলাকার বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা, জামায়াতের উর্ধ্বতন সংগঠন থেকে প্রেরিত সার্কুলার ও নির্দেশ পালন করা হচ্ছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখা দায়িত্বশীলের রুটীন বাঁধা কাজ। এ কাজটুকু হয়ে গেলেই যদি তিনি দায়মুক্ত হলেন বলে মনে করেন তাহলে বিরাট ভুল হয়ে যাবে।

দায়িত্বশীলদের সবচাইতে বড় টারগেট হতে হবে এলাকার সকল স্তরে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলা। জিলা আমীর পৌরসভা ও থানা ভিত্তিক সম্ভাবনাময় কর্মীদের একটা তালিকা নিজের হিসাবে রাখলে তাদেরকে স্টাডী সার্কেল, টিএস ও টিসি'র মাধ্যমে গড়ে তুলতে পারবেন। বিভিন্ন সময় সফরে তাদের মধ্য থেকে দু'একজনকে সাথে নিলে তারা অনেক বাস্তব শিক্ষা পাবেন এবং গড়ে উঠবেন।

থানা আমীর বা নাযিমকেও তার সব ইউনিয়ন থেকে অনুরূপভাবে বাছাইকৃতদের তালিকা রেখে তাদেরকে গড়ার চেষ্টা করতে হবে।

মৌলিক মানবীয় গুণের অধিকারী যেসব লোক এখনও সংগঠনে আসেনি বা অন্য কোন দলে কাজ করছে তাদের তালিকাও তৈরী করা উচিত এবং তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা টারগেটের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া প্রয়োজন। প্রকৃত পক্ষে নেতৃত্বের যোগ্য লোক যোগাড় করার সাধনাই দায়িত্বশীলদের বড় ধান্দা হতে হবে। কারণ ইসলামী আন্দোলনের বিজয় প্রধানত এরই উপর নির্ভর করে।

রুকনিয়াতের মর্যাদা

প্রাথমিক কথা

১৯৮৯ সালের রুকন সম্মেলনে 'রুকনিয়াতের দায়িত্ব' সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। রুকনিয়াতের শপথ নেবার সময় যেসব কথা আল্লাহ পাককে সাক্ষী রেখে নেয়া হয় তার মধ্যে কতক দায়িত্বের স্পষ্ট স্বীকৃতি রয়েছে। এ দায়িত্ব প্রত্যেক রুকন নিজের স্বাধীন ইচ্ছায়ই নিয়ে থাকে। কেউ এ বিষয়ে কাউকে বাধ্য করে না। কিন্তু দেখা যায় যে, এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা হয়ে যায়। ক্রমে মান কমে যেতে থাকে। সংগঠনের পক্ষ থেকে মানের ব্যাপারে হিসাব কষে সাধারণ মান, নিম্ন মান, এমনকি বিপদসীমা পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে দিতে হয়েছে। এ সীমা লংঘন করলে রুকনিয়াত বাতিল করতেও বাধ্য হতে হয়।

অথচ রুকন হবার পূর্বে একটা ভাল মানে উন্নীত হবার ফলেই একজন কর্মীকে রুকন করা হয়। রুকন হবার সময় যে শপথ নেয়া হয় সে হিসাবে চললে রুকনিয়াতের মান ক্রমে আরও উন্নত হবারই কথা। উন্নতির বদলে অবনতি হওয়া মোটেই কাম্য নয়, স্বাভাবিকও নয়। কিন্তু বাস্তবে অবনতি হতে কেন দেখা যায় সে বিষয়ে আমি যথেষ্ট চিন্তা করেছি। যেসব রুকনের মানে অবনতি হয় তাদের অনেকের অবস্থা বিশ্লেষণ করে আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে রুকনিয়াতের 'মর্যাদা' সম্পর্কে সচেতনতার অভাবই এর জন্য প্রধানত দায়ী।

রুকন হওয়া মানে শুধু জামায়াতে ইসলামীর পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ গ্রহণ করাই নয়, আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য জান, মাল, সময়, শ্রম, আবেগ ইত্যাদি সবকিছুই কুরবানী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বুঝায়। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আল্লাহ পাকের দরবারে যে মর্যাদার আশা করা যায় সে কথা মন-মগজে সজাগ থাকলে মান বৃদ্ধি পাওয়ারই কথা। এ সিদ্ধান্ত নিতে পারা যে আল্লাহর পক্ষ থেকে কত বড় মেহেরবানী তা গভীরভাবে উপলব্ধি করার বিষয়।

সাংগঠনিক মর্যাদা

জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক কাঠামোতে রুকনিয়াতের বিরাট মর্যাদা রয়েছে। জামায়াতের লক্ষ লক্ষ সহযোগী সদস্যের মধ্যে যারা রুকনিয়াতের কঠিন দায়িত্বের বোঝা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে, জামায়াতের গঠনতন্ত্র তাদের উপর যাবতীয় সাংগঠনিক ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করে। যেমন ঃ

১. কেন্দ্রীয় আমীর সহ সংগঠনের সকল স্তরে একমাত্র রুকনদের ভোটেই আমীর নির্বাচিত হয়।

২. কেন্দ্রীয় মাজলিসে শুরা থেকে শুরু করে সর্বস্তরে শুরা সদস্যগণ রুকনদের প্রতিনিধি হিসাবে তাদের ভোটে নির্বাচিত হয়।

৩. সকল স্তরে রুকন সম্মেলনই সকল বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা রাখে। আমীর, কর্ম পরিষদ ও মাজলিসে শুরার যে কোন সিদ্ধান্ত রুকন সম্মেলন নাকচ করার অধিকারী।

৪. গঠনতন্ত্র অনুযায়ী জামায়াতের কেন্দ্রীয় রুকন সম্মেলনই সংগঠনের সকল বিষয়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী।

রুকন বাছাই-এর উদ্দেশ্য

আল্লাহর রহমতে বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর বিপুলসংখ্যক সমর্থক ও শুভাকাংখী রয়েছে। তাদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক জামায়াতের সহযোগী সদস্য। তাদের থেকেই কর্মী হয় এবং ক্রমে অগ্রসর হতে হতে রুকনিয়াতের মানে উন্নীত হয়। যেসব রাজনৈতিক দল এদেশে ক্ষমতায় ছিল ও বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে ক্ষমতাসীন হবার আশা রাখে তারা এ ধরনের সাংগঠনিক পদ্ধতি গ্রহণ করে না। তাই এ প্রশ্ন উঠে যে, জামায়াত এ জাতীয় সাংগঠনিক কড়াকড়ি করা কেন প্রয়োজন মনে করে? জামায়াতে ইসলামীকে ক্ষমতায় যেতে হলে এ পদ্ধতিতে কেমন করে তা সম্ভব হবে?

আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে একটি ইসলামী কল্যাণরাষ্ট্র কায়েমের জন্যই জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় যেতে চায়। এর জন্য প্রয়োজন একদল লোক তৈরী করা। অতীতে ইসলামের নামে যারা ক্ষমতায় গিয়েছে তারা ইসলাম কায়েম করতে সক্ষম হয়নি বরং ইসলামের নামে ভুল প্রতিনিধিত্ব করেছে, কারণ তাদের হাতে

ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার উপযোগী লোক ছিল না। এ জন্যেই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ লোক তৈরীর এ সাংগঠনিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে যাতে ক্ষমতায় গিয়ে জামায়াতে ইসলামী আল্লাহর হুকুমাত কায়েমের লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়।

এ লক্ষ্য হাসিলের জন্য বাছাই করা লোকদেরকেই রুকন করা হয় এবং তাদেরকে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ দেয়া হয়। ঈমান, ইলম, আমল, তাকওয়া, ইখলাস ও কুরবানীর মাধ্যমে ইকামাতে দ্বীনের যোগ্য হয়ে যারা গড়ে উঠে তাদেই রুকন হওয়া সার্থক।

এ বাছাই আসল বাছাই নয়

জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে থেকে বাছাই করে যে রুকন করা হয় এটা কিন্তু আসল বাছাই নয়। আসল বাছাই আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং করেন। ঐ বাছাইতে যারা টিকে তারাই খাঁটি রুকন।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হবার সিদ্ধান্ত যে নেয় সে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। তাকে সংগ্রাম করে ঐ সব পরীক্ষায় পাস করতে হয়। প্রথমে তাকে নিজের ভেতরের শয়তানরূপ নাফসের সাথে লড়াই করতে হয়। তারপর পরিবার থেকে বাধা আসতে পারে। অনেককে বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদের বিরোধিতার মুকাবিলাও করতে হয়। রুযি-রোযগারে হারাম থেকে বাঁচার সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয় চাকুরী জীবনেও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এসব পরীক্ষায় মোটামুটি পাস করতে পারলে জামায়াত তাকে রুকন বানিয়ে নেয়।

রুকনিয়াতের শপথ নেবার সময় আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আল্লাহর বান্দাহদের সামনে যখন একজন রুকন এ কথা ঘোষণা করে যে,

اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

(আমার নামায, আমার ইবাদাত, আমার হায়াত ও আমার মওত আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য) তখন থেকেই আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। যে ব্যক্তি মুখে এত বড় দুঃসাহসী দাবী করে বসল সে এ দাবীতে কতটা সত্যবাদী তা পরীক্ষা না করে আল্লাহ ছাড়েন না। আল্লাহ সূরা আল-আনকাবুতের পয়লা আয়াতে প্রশ্ন তুলেছেন যে-

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ـ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ـ

"মানুষ কি এ হিসাব করে যে, 'ঈমান এনেছি' দাবী করার পর বিনা পরীক্ষায় তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও আমি পরীক্ষা করেছি। (ঈমান এনেছি) বলার মধ্যে কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী তা আল্লাহ্ অবশ্যই জেনে নিবেন।"

আল্লাহ্ কিভাবে পরীক্ষা করেন

সূরা আল-বাকারাহ্'র ১৫৫ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ .

"আমি অবশ্যই ভয়, ক্ষুধা, জান ও মালের ক্ষতি এবং ফসলাদির (আয় রোযগারের কমতি দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করব।"

এসব পরীক্ষার ব্যাপারে আমাদের সবারই কম-বেশী অভিজ্ঞতা রয়েছে। ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনে চলার পথে বিভিন্ন রকমের ভয় ও বাধার সম্মুখীন হতে হয়। হারাম থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে গিয়ে অভাবগ্রস্ত হতে হয়। জান-মালের ক্ষতি, এমনকি নিজের জীবনও বিপন্ন হয়।

এসব পরীক্ষা আসবে জেনেও যারা এ পথে এগুতে সাহস করে তারা এসব অবস্থায়ই ধৈর্য ধারণ করতে হিম্মত পায়। তারা ঘাবড়ায় না। আল্লাহর উপর ভরসা করে মযবুত থাকার চেষ্টা করে। এভাবে যারা 'সবর অবলম্বন করে তাদের সম্পর্কে ১৫৫ নং আয়াতের শেষাংশে ও ১৫৬ আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ـ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ـ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ـ

"ঐ সব ধৈর্যশীলকে সুসংবাদ দাও যারা মুসিবতের সময় বলে যে আমরা তো আল্লাহরই জন্য। আর তাঁর কাছেই আমরা ফিরে যাব।"

এমন মযবুত মনোবলের পরিচয় যারা দেয় তাদের সম্পর্কে ১৫৭ নং আয়াতে আল্লাহ মন্তব্য করেন ঃ

أُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ قف وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ -

"এরাই ঐসব লোক যাদের উপর তাদের রবের পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়েছে এবং এরাই হিদায়াতপ্রাপ্ত লোক।"

এ কথা দ্বারা বুঝা গেল যে, ধৈর্য ধারণ করতে সক্ষম হওয়াটাই আল্লাহর বিরাট রহমত। আখিরাতে তো এর বদলায় রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।

لَتُبْلَوُنَّ فِىْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذًى كَثِيْرًا - وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ -

আল্লাহ কেন এ পরীক্ষা করেন

আমরা ঘোষণা করছি যে, জামায়াতে ইসলামী আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম করতে চায়। এ ঘোষণার অর্থ এটাই যে, আমাদের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা আসলে আমরা আল্লাহর আইন কায়েম করব। ওদিকে সূরা আন্-নূরের ৫৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে, এ কাজ করার যোগ্যতা যাদের মধ্যে পাওয়া যাবে তাদেরকে তিনি অবশ্যই ক্ষমতা দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ - وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا

এক দল লোক তৈরী হলে তো আল্লাহ্ অবশ্যই ওয়াদা পূরণ করবেন। এ যোগ্যতা এমন গুণাবলীর সমষ্টি যা বিনা পরীক্ষায় সৃষ্টি হয় না।

রাসূল (স.) এর সাহাবীগণ ১৩ বছর পর্যন্ত কত কঠোর পরীক্ষা দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত বাড়ীঘর, জমিজমা, আত্মীয়স্বজন এমনকি জন্মভূমির মতো প্রিয় বিষয়ও ত্যাগ করে হিজরত করতে বাধ্য হন। এ চরম পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হলেন তাদের হাতেই আল্লাহ পাক মদীনার ক্ষমতা তুলে দিলেন। বিনা পরীক্ষায় এত বড় দায়িত্ব দেননি। কারণ রাষ্ট্রক্ষমতা মানুষকে হাজারো প্রকার ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হওয়া, ক্ষমতার অন্যায় ব্যবহার করা, মানুষের উপর যুলুম ও শোষণ চালাবার নিরংকুশ সুযোগও এনে দেয়।

যারা মাক্কী জীবনের সংগ্রাম যুগে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সাফল্যের লোভে যাবতীয় ভয়-ভীতিকে অগ্রাহ্য করেছেন, শত অত্যাচার সত্ত্বেও ঈমান ত্যাগ করেননি, দুনিয়ার সবকিছু ত্যাগ করে হিজরত করলেন তারা ক্ষমতায় যেয়ে কি ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হতে পারেন? দুনিয়ার সুখ-সুবিধাই যদি তাদের জীবনের লক্ষ্য হতো তাহলে ঈমানের পথই ত্যাগ করতেন। ক্ষমতা পেয়ে অন্যায় পথে ধন-সম্পদ কামাই করার লোভই যদি তাদের থাকতো তাহলে নিজেদের বৈধ সম্পদ ত্যাগ করে হিজরত করার কি দরকার ছিল? আল্লাহর সন্তুষ্টির স্বার্থে যারা আপনজনের মহব্বত ত্যাগ করে হিজরত করলেন তারা ক্ষমতা হাতে পেয়ে কি স্বজনপ্রীতি করতে পারেন?

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যেসব গুণাবলী অর্জন করার কারণে আল্লাহ্ তাঁদের হাতে খিলাফতের দায়িত্ব তুলে দিলেন সে উন্নত মানবিক চরিত্র যদি বিনা পরীক্ষায়ই হাসিল করা যেতো তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা অনর্থক তাদেরকে এত কষ্ট সহ্য করতে দিতেন না।

দ্বীনকে বিজয়ী করার চূড়ান্ত ইখতিয়ার আল্লাহর হাতে। তিনি এমন লোকদের হাতে দ্বীন কায়েমের সুযোগ দেন না যারা এ কাজের অযোগ্য। তাই যারা এ মহান কাজ করতে আগ্রহী আল্লাহ্ তাদেরকে যোগ্য বানাবার উদ্দেশ্যেই পরীক্ষায় ফেলেন। জামায়াতের বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেও পরীক্ষা হয়। জামায়াতের বাইতুল মাল, নির্বাচনী তহবিল, রিলিফের সম্পদ ব্যয় করার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেও পরীক্ষা করা হচ্ছে।

বিশেষ করে বর্তমানে দেশের সকল বাতিল শক্তি একজোট হয়ে ইসলামী আন্দোলনকে 'নির্মূল' করার জন্য যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তাতে ইকামাতে দ্বীনের যোগ্য লোক বাছাই হওয়ার আরও বড় সুযোগ এসেছে। গত দশ বছরে ইসলামী আন্দোলনের ৬৫ জন মুজাহিদ শহীদ হয়েছেন। এ উপলক্ষে সূরা আল-আহযাবের ২৩ নং আয়াত মনে পড়ছে যেখানে বলা হয়েছে ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوْا اللّٰهَ عَلَيْهِ ج فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ز وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً ـ

"ঈমানদারদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহর নিকট কৃত তাদের ওয়াদাকে সত্য প্রমাণ করেছে। তাদের মধ্যে কতক জীবন দিয়েছে, আর কতক (জীবন দিবার জন্য প্রস্তুত হয়ে) সময়ের অপেক্ষায় আছে। তাদের আচরণ (ওয়াদা পালনের ব্যাপারে তাদের মনোভাব) পরিবর্তন করেনি।"

পরীক্ষায় ফেল হয় কেন

যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন আপদ-বিপদ আসে তখন তারাই পাস করে যারা এটাকে পরীক্ষা বলে মনে করে এবং সতর্ক হয়ে চলে যাতে ফেল না হয়ে যায়। এ পথে পরীক্ষা যে আসবেই সে কথা আগে থেকেই জানা থাকলে মনের দিক দিয়ে মযবুত থাকার জন্য স্বাভাবিকভাবেই প্রস্তুত থাকে। আর যদি এ কথার উপর বিশ্বাস থাকে যে, আল্লাহর ইচ্ছায়ই বিপদ এসেছে তাহলে মন পেরেশান হয় না। সূরা আত-তাগাবুনের ১১ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ـ

"কোন বিপদই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া আসে না। যে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে আল্লাহ তার দিলকে (এ অবস্থায়) হেদায়াত দান করেন। আর আল্লাহ তো সবকিছুই জানেন।"

সত্যিকার মুমিন বিপদে ঘাবড়ায় না। কারণ সে জানে যে, আল্লাহই এ বিপদ দিয়েছেন। আল্লাহ নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন মংগল রেখেছেন বলে সে

বিশ্বাস করে। কারণ আল্লাহ্ অমংগল করেন না। তাই মুমিন ধীর চিত্তে মাথা ঠাণ্ডা রেখে বিপদে সবর ইখতিয়ার করে এবং ঐ অবস্থায় আল্লাহ পাক তাকে যা করার জন্য হিদায়াত দেন সেভাবেই সে কাজ করে। এ পরীক্ষায় যে সাফল্য লাভ হয় সেজন্য সে মাবূদের দরবারে কাতরভাবে ধরনা দেয়।

পরীক্ষায় তারাই ফেল করে যারা একথা ভুলে যায় যে বিপদ আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে এবং আল্লাহর বিনা অনুমতিতে আসেনি। ব্যাপারটা এমন নয় যে বিপদ আসতে আল্লাহ্ বাধা দিতে সক্ষম হননি। মুসীবতকে পরীক্ষা মনে না করার কারণেই মনে পেরেশানী আসে, কী করবে না করবে দিশা পায় না। ঘাবড়িয়ে গিয়ে এমন সব ভুল করে যে বিপদকে জটিল করে ফেলে। ঘাবড়াবার কারণে আল্লাহর কাছ থেকে করণীয় সম্পর্কে হেদায়াতও পায় না।

এ অবস্থা যখন কোন রুকনের হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই সে রুকনিয়াতের দায়িত্ব পালনে আগের মতো সক্রিয় থাকে না। দৈনন্দিন যেসব কাজের রিপোর্ট রাখতে হয় সে কাজগুলো নিয়মিত হয় না। সাংগঠনিক বৈঠকাদিতেও যথারীতি হাজির থাকে না। তার উপর ন্যস্ত বিভিন্ন সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনেও অবহেলা হতে থাকে।

যখন সংগঠন তার নিষ্ক্রিয়তা ও অবহেলার কারণ জানতে চায় তখন তার কথা বলার ধরনও অসুন্দর হয়। সে বলে ঃ "আমি যে কী হালে আছি সে খবর আপনারা নিয়েছেন? আমি কি আগে কাজ করিনি? আমি এখন কেমন করে দায়িত্ব পালন করব? আমি যে আপদ-বিপদে আছি সে পেরেশানীতেই ব্যস্ত। আমার খোঁজ ও খবর না নিয়ে কৈফিয়ৎ তলব করা হচ্ছে।" এসব কথা ক্ষোভের সাথে প্রকাশ করে নিজের নিষ্ক্রিয়তাকে সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ বলে দাবী করার সাথে সাথে কৈফিয়ৎ তলব করার জন্য সংগঠনকেই দোষী সাব্যস্ত করে ফেলা হয়। তার আগের তৎপরতার উল্লেখ করে নিজের সাফাই এমনভাবে পেশ করে যেন সংগঠনের উপর সে পূর্বে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছে।

যে রুকনের এ দশা হয় তার পক্ষে এ পথে টিকে থাকা সম্ভব হয় না। কারণ আল্লাহ বিপদ দিয়েছিলেন পরীক্ষা করার জন্য। বিপদের মধ্যেও সাধ্য মতো দ্বীনের দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করাই কর্তব্য ছিল। আল্লাহ পাক এটাই দেখতে চেয়েছেন যে আপদ-বিপদ এলে রুকনিয়াতের শপথ মনে থাকে

কিনা। সে বিপদকে পরীক্ষা মনে না করে এটাকে কাজ না করার অজুহাত বানিয়ে নিয়েছে। এভাবেই সে পরীক্ষায় ফেল হয়ে যায়। পরিণামে হয় সে নিজেই রুকনিয়াত ত্যাগ করে, আর না হয় সংগঠন তার রুকনিয়াত বাতিল করতে বাধ্য হয়।

যে রুকন বিপদ-আপদকে পরীক্ষা বলে মনে করে সে নিজেই সংগঠনে তার স্থানীয় ভাইদেরকে তার অবস্থা জানিয়ে দোয়া চায় যাতে রুকনিয়াতের মান বজায় রাখতে পারে। তার উপরে কোন সাংগঠনিক দায়িত্ব থাকলে ঊর্ধ্বতন দায়িত্বশীলকে তার অবস্থা জানিয়ে সাময়িকভাবে অব্যাহতিও চাইতে পারে। তার দ্বীনি সাথীরা এমন নির্দয় ও অবিবেচক নয় যে, তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য তাকে চাপ দেবে। বরং সংগঠনের মধ্যে তার সহকর্মীরা অত্যন্ত দরদের সাথে তার অবস্থা বিবেচনা করবে এবং সম্ভব হলে তার মুসীবত দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাও করবে।

সে আগের মতো কর্মতৎপর হতে না পারার কারণে নিজেই আফসোস করে এবং সাথীদের নিকট লজ্জিত হয়। সংগঠন তার নিকট কৈফিয়ৎ তলবের বদলে তার দায়িত্বের বোঝা হালকা করে দেয় যাতে আবার যথাসময়ে সে এগিয়ে আসার জন্য প্রেরণা বোধ করে।

আল্লাহর বাছাই ও ছাঁটাই নীতি

হেদায়াত ও গোমরাহী আল্লাহ পাকের ইখতিয়ারে রয়েছে। তিনি যাকে চান হেদায়াত দান করেন, যাকে এর যোগ্য মনে না করেন তাকে গোমরাহীতেই থাকতে দেন। এ ব্যাপারটা আল্লাহ তায়ালার কোন খামখেয়ালী কারবার নয়। আল্লাহ জোর করে কাউকে হেদায়াতে করেন না, আর গোমরাহ হতেও কাউকে বাধ্য করেন না। তিনি সবার মনের খবরই রাখেন। যার মন-মগজ হেদায়াতের উপযোগী তাকেই হেদায়াতের নিয়ামত দান করেন।

হেদায়াত আল্লাহর দেয়া এত বড় নিয়ামত যে এর প্রতি অবহেলা করলে হেদায়াতপ্রাপ্ত হওয়ার পরও আবার গোমরাহ হবার আশংকা রয়েছে। তাই আল্লাহ নিজেই এ দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন ঃ

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ـ

"হে আমাদের রব, তুমি আমাদেরকে হেদায়াত করার পর আমাদের দিলকে বাঁকা করে দিও না। তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর। প্রকৃত দাতা তো তুমিই।"

(সূরা আলে ইমরান ৮ আয়াত)

সুতরাং হেদায়াতের নিয়ামত লাভ করার পর এর কদর করা কর্তব্য এবং হোদায়াতের উপর কায়েম থাকার জন্য সতর্ক থাকা প্রয়োজন। বিশেষ করে ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনে শরীক হবার মহা সৌভাগ্য যাদের হয়েছে তাদের আরও বেশী সাবধান হতে হবে যাতে অবহেলার কারণে ছাঁটাই হয়ে না যায়। একথা মনে রাখতে হবে যে, বাছাই ও ছাঁটাই আল্লাহরই মরযীর উপর নির্ভর করে। সূরা আশ্ শূরার ১৩ নং আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

اَللّٰهُ يَجْتَبِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ـ

"আল্লাহ যাকে চান তাকেই আপন করে নেন এবং তাকেই পথ দেখান যে তার দিকে মনোযোগী হয়।"

আল্লাহর বাছাই-এর প্রমাণ

কোন লোককে আল্লাহ তায়ালা তার দ্বীনের পথে চলার জন্য বাছাই করে নিলেন কিনা তা ঐ লোকের বাস্তব জীবনের কর্ম তৎপরতার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। যাকে তিনি বাছাই করেন তাকে দ্বীনের পথে চলার সকল বাধা উপেক্ষা করার তাওফীক দান করেন। কোন বাধা, কোন সমস্যা, কোন বিপদ তার চলার গতি রোধ করতে পারে না। যেহেতু সে আল্লাহর সন্তুষ্টির কাংগাল সেহেতু সে কোন সমস্যারই পরওয়া করে না। এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যারা, আল্লাহ তাদেরকেই সাহায্য করেন। যে মৃত্যুরই পরওয়া করে না, শাহাদাতই যার কাম্য সে অন্য কোন সমস্যা ও আপদ বিপদে দমে যেতে পারে না।

যারা মক্কা থেকে হিজরাত করে মদীনায় যেয়ে নতুন একটি ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করার কারণে গোটা আরবের জাহেলী শক্তির মুকাবিলা করতে বাধ্য হলেন তাদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ সূরা আল-হাজ্জ-এর শেষ আয়াতে বলেন ঃ

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ط هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ـ

"জিহাদের হক আদায় করে আল্লাহর পথে জিহাদ কর। তিনিই তোমাদের বাছাই করে নিয়েছেন। দ্বীনের মধ্যে তিনি তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা (বা কঠোরতা) চাপিয়ে দেননি।"

সাহাবায়ে কেরাম দ্বীনের খাতিরে সব রকম কুরবানী করেছেন, এমনকি হিজরত করতেও মনে সংকীর্ণতা বোধ করেননি। কোন বাধা বিপত্তিই তাদের জিহাদের কঠিন পথে চলা বন্ধ করতে পারেনি। এসব কিছু করার তাওফীক তাদের এ কারণেই হয়েছে যে আল্লাহ তাদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন। আল্লাহ স্বয়ং যাদেরকে এ কঠিন পথে চলার জন্য মনোনীত করেছেন তাদের কঠিন পথকে তিনিই সহজ করে দেন। সূরা আল-লাইলের ৫ থেকে ৭ আয়াতে একথাই বলা হয়েছে।

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى - وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى - فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى -

"তবে যে (আল্লাহর পথে) দান করেছে ও (আল্লাহর নাফরমানী থেকে) নিজকে বাঁচিয়েছে এবং যা ভাল তাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে তার জন্য আমি সহজ পথে চলার সুযোগ করে দেব।"

হে মাবুদ ছাঁটাই হওয়া থেকে হেফাযত কর

আমাদের মেহেরবান মনিব ইকামাতে দ্বীনের জিহাদে জীবন উৎসর্গ করার জযবা দিয়েছেন বলেই আমরা জামায়াতে ইসলামীর মতো শহীদী কাফেলার রুকনিয়াত কবুল করার হিম্মত করতে পেরেছি। তাফহীমুল কুরআন ও অন্যান্য ইসলামী সাহিত্য থেকে এ কঠিন পথের সব রকম পরীক্ষার কথা জেনে বুঝেই আমরা রুকনিয়াতের শপথ নিয়েছি। আমরা সচেতনভাবে এবং স্বেচ্ছায় আমাদের জান ও মাল আল্লাহ পাকের নিকট বিক্রয় করেছি। কারণ আমরা যে জান্নাতের কাংগাল। আর জান্নাতের বিনিময় মূল্য জান ও মাল।

আমরা তো দুনিয়ার অবাধ উন্নতি ও সুখের মোহ ত্যাগ করেই এ পথে এসেছি। আমাদের হায়াত ও মওত আল্লাহর জন্যই উৎসর্গ করার কথা ঘোষণা করেছি। তাহলে দুনিয়ার ঝন্‌ঝাট-ঝামেলা ও সমস্যা এ পথে চলার জন্য বাধা হিসাবে গণ্য হতে পারে না। যদি কোন সমস্যাকে বাধা হিসাবে

আমরা গণ্য করি তাহলে বুঝতে হবে যে ছাঁটাই-এর মুসীবতে পড়ে গেছি। বাছাই-এর মধ্যে বহাল থাকলে কোন বাধাই حَرَجٍ বা সংকীর্ণতা বলে গণ্য হতে পারে না।

এ বিষয়ে আমাদের সদা সতর্ক থাকতে হবে। এর জন্য আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। দুনিয়া ও আখিরাতে তিনিই আমাদের অভয় দান করেছেন সূরা হা-মীম আস-সাজদার ৩১ নং আয়াতে ....

نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ـ

অর্থাৎ ঃ দুনিয়া ও আখিরাতে আমিই তোমাদের অভিভাবক। সেখানে (বেহেশতে) তোমরা যা চাইবে তাতো পাবেই এমনকি তোমাদের মনে যা ইচ্ছা করবে তাও পাবে।

আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে তার বাছাইকৃত বান্দাহদের মধ্যে গণ্য করেন এবং ছাঁটাই হওয়া থেকে হেফাযত করেন সে জন্য তাঁরই দরবারে ধরনা দিয়ে থাকতে হবে।

রুকনদের মান বৃদ্ধির গুরুত্ব

এ পর্যন্ত যারা ক্ষমতায় গিয়েছেন বা আছেন তারা তাদের কার্যক্রম ও কর্মকাণ্ড দ্বারা এটা স্পষ্ট করে তুলেছেন যে, ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে দেশ পরিচালনা করার পরিকল্পনা ও যোগ্যতা তাদের নেই। এ কারণে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামীকেই দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু আমরা যারা জামায়াতের রুকন হয়েছি তাদের মান বৃদ্ধি না হলে আল্লাহ পাক এ দায়িত্ব পালনের সুযোগ কিছুতেই দেবেন না।

যদি দেশবাসী ইসলামের বাস্তব নমুনা আমাদের আমল-আখলাক ও জনকল্যাণমূলক ভূমিকার মধ্যে দেখতে না পায় তাহলে জামায়াতের উপর তাদের আস্থা সৃষ্টি হতে পারে না। আর জনগণের আস্থা অর্জন করতে না পারলে তাদের খেদমত করার সুযোগও পাওয়া যাবে না। পূর্বে যারা

ক্ষমতায় ছিল তারা জনগণের আস্থা হারিয়েছে। বর্তমানে যারা ক্ষমতায় আছে তাদের প্রতিও আস্থা হারাতে থাকাই স্বাভাবিক। এ অবস্থায় তাদের আস্থা অর্জনের যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারলে জামায়াতের প্রতি দেশবাসী অবশ্যই আকৃষ্ট হবে। কিন্তু এটা নির্ভর করে রুকনদের সার্বিক উন্নতির উপর।

সৎ লোকের অভাব সবাই অনুভব করছে। সৎ নেতৃত্ব ছাড়া যে দেশ গড়ার কাজ হতে পারে না সে কথা সব মহলেই ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। সৎ নেতৃত্বের যোগ্য লোক যোগান দেবার দায়িত্ব জামায়াতকেই পালন করতে হবে। পাড়ায়, মহল্লায়, গ্রামে ও ইউনিয়নে পর্যন্ত সৎ নেতৃত্ব প্রয়োজন। সৎ চরিত্র গড়ে তুলবার এমন চমৎকার সাংগঠনিক ব্যবস্থা জামায়াতে ইসলামীতে থাকা সত্ত্বেও যদি সৎ নেতৃত্ব পরিবেশন করতে আমরা সক্ষম না হই তাহলে এ দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তাই রুকনদের মান বৃদ্ধির উপরই দ্বীনের বিজয় ও দেশের কল্যাণ সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে দেশের ও দ্বীনের এ বিরাট চাহিদা পূরণের তাওফীক দিন। আমীন।

জামায়াতে ইসলামীকে ভালভাবে জানতে হলে পড়ুন

জামায়াতে ইসলামীর পরিচয়
- পরিচিতি– বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
- বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী
- জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য
- জামায়াতে ইসলামীর কর্মনীতি
- ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি
- মুসলমানদের অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মসূচি

জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন
- গঠনতন্ত্র- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
- মেনিফেস্টো– বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
- সংগঠন পদ্ধতি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
- ব্যক্তিগত রিপোর্ট বই
- অমুসলিম নাগরিক ও জামায়াতে ইসলামী
- ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি

জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন
- সত্যের সাক্ষ্য
- ইকামাতে দীন
- ইসলামী বিপ্লবের পথ
- বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ও জামায়াতে ইসলামী

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস
- জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী ১ম ও ২য় খণ্ড
- জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস
- মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস

প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৫, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯